নজরুল প্রতিভা

লায়েক আলি খান

নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭



প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭
এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ইরানীকে

ভূমিকা

আমাদের দেশে ব্যক্তি নজরুলকে নিয়ে গালগল্প যত লেখা হয়েছে ঠিক তত কম চর্চা হয়েছে কবি তথা শিল্পী নজরুলের সামগ্রিক সত্তার। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সাম্মানিক বাংলা বিভাগে নজরুল পাঠ্য হওয়ায় শিল্পী নজরুলের মূল্যায়ণ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার একটা পথ খুলে গেল। এটা আনন্দের ব্যাপার।

এই সুবাদে 'নজরুল প্রতিভা' সম্পর্কিত আমার দীর্ঘকালীন ভাবনাগুলিকে একত্রিত করবার একটা চেষ্টা হয়েছে "নজরুল প্রতিভা" গ্রন্থে। সমকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে নজরুল প্রতিভার বিকাশ, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতির একটা ইতিবৃত্ত নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা হয়েছে বইটির প্রবন্ধগুলিতে। বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে নজরুলের রচনার সাধ্যে তাঁর শিল্পী সত্তার রূপরেখা অঙ্কনের এই প্রয়াস নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী সর্বস্তরের পাঠককেই নতুন করে ভাবাবে আশা করি।

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঋণ, তথ্যপঞ্জীর যথাস্থানে স্বীকৃত। কিন্তু পরোক্ষ ঋণের উৎস যদিও সীমাহীন তবু কয়েক জনের কথা উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী করা হবে। প্রথমে মনেপড়ে আমার বাবার কথা পোষ্ট অফিসের কঠিন পরিশ্রম শেষে যিনি সন্ধ্যায় ফিরে কোলের কাছে টেনে নিতেন এক পাঁচ বছরের বালককে। তার পিঠে তাল দিয়ে দিয়ে শোনাতেন নজরুলের কবিতা—'যেদিন আমি হারিয়ে যাবো··· 'এবং আরো অনেক আজও সে স্মৃতি দুর্মর ভাবে আমাকে বিদ্ধ করে। কিংবা তাঁর কণ্ঠের ইকবালের শেকোয়ার প্রাথমিক পংক্তিগুলো আজও কানে বাজে। নজরুলের সঙ্গে ইকবালের তুলনাত্মক আলোচনায় সাহায্য করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু সাহিত্যের পি. এইচ. ডি-র ছাত্রী শাহানাজ নবী। তাঁর অসুস্থতা নিয়েও তিনি আমাকে ইকবালের প্রয়োজনীয় পাঠ দিতে ছিলেন চরম উৎসাহে। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করবার দুঃসাহস আমার নেই। 'নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধটি রচনার ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার এক কালের সহকর্মী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, বর্তমান মুর্শিদাবাদ ইসলামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. মুজিবর

রহমান সাহেব। এখানে তাঁর নাম স্মরণ-কৃতজ্ঞতায় নয়, আমার প্রতি তাঁর অনর্গল স্নেহের স্বীকৃতি হিসেবে। সহকর্মী এবং সুহৃদ সুজিত নারায়ন চট্টোপাধ্যায়ও রচনাকালে নানান প্রসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

এছাড়াও আমাকে উৎসাহিত করেছেন কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকগণ। বিশেষ করে অধ্যাপক শিশির কুমার দাস ও অধ্যাপক ড. সুধাংশু কুমার শাসমল মহাশয় আমাকে গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন প্রতিনিয়ত। আমি তাঁদের ছাত্র। আমার জন্য তাঁদের নিরন্তর উচ্চাকাঙ্খা আমাকে উৎসাহী করেছে নিঃসন্দেহে। প্রবন্ধগুলো লেখার সময় অধ্যাপক ড. শ্রীমন্ত জানা মহাশয় অনেক সময় ধৈর্য ধরে আমার যুক্তিগুলো শুনেছেন। এবং উৎসাহিত করেছেন বইটি ছাপানোর চেষ্টা করতে। আর আছেন অগ্রজ প্রতিম শ্রীকমল কুমার মুখোপাধ্যায়। যিনি সমগ্র পরিকল্পনার নেপথ্যে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আমাকে ঋণবদ্ধ করেছেন। বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরী করেদিয়েছেন বিশ্বরূপা সিনহা গভীর উৎসাহে। এ তাঁর বন্ধু-কৃত্য বলে তিনি মনে করেছেন। বন্ধুবর আবুল কাবীর সাহেব (এম. এ)-র আন্তরিক অনুপ্রেরণাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছে অনুক্ষণ। সর্বোপরি, নবজাতক প্রকাশনের দুঃসাহসী প্রকাশক মজহারুল ইসলাম সাহেবের চেষ্টা ও সাহায্য না থাকলে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠাহীন লেখকের বই প্রকাশিত হোতোনা এটা মানতেই হবে। নজরুল সম্বন্ধে তার গভীর শ্রদ্ধা ও কৌতুহল আমার নজরুল প্রতিভার নব মূল্যায়ণকে মর্যাদা দিয়েছে বলে আমি ধন্য।

অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
ডি. এন. কলেজ,
মুর্শিদাবাদ

লায়েক খালি খান

সূচীপত্র

নজরুল প্রতিভার প্রস্তুতিপর্ব

১৮৯৯-১৯২১

নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্বের অবিসংবাদিত আধিপত্য। রবীন্দ্রনাথের বয়স ৩৮ বছর। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যাভিসার শেষ করে রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা'র নীতি-কবিতা প্রকাশ করছেন। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের সমকালীন অন্যান্য উল্লেখ্য তারকাদের মধ্যে অক্ষয় বড়ালের বয়স ৩৯, দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৬, ক্ষীরোদপ্রসাদ ৩৫, দেবেন সেন ৪৫, গোবিন্দচন্দ্র দাস ৪৩ বছরে পৌঁছেছেন, হেম ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশার ক্রান্তিলগ্ন। নবীনদের মধ্যে সত্যেন দত্তের বয়স ১৭, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২১, করুণা নিধান ২২ ও শরৎচন্দ্র ২৩ বছরের যুবক।

ইংরেজশাসনের ১৪২ বছর অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান পরিবার অবক্ষয়ের চরমে। এর মূলে আছে বিজয়ী ইংরেজদের প্রতি বিজিত মুসলমানদের সক্ষোভ আত্মসংকোচন। এবং সিপাহী বিদ্রোহ-পরবর্তী ইংরেজ সরকারের মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও কঠোর মানসিকতা। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরবর্তী হয়ে আর্থিক অনটনে ভুগছে। এমনি এক পরিবারে নজরুল জন্মালেন। পিতা কাজী ফকির আহম্মদ, গ্রাম চুরুলিয়া, জেলা বর্ধমান। কাজীর পূর্বপুরুষগণ সম্রাট শাহ আলমের সময় পাটনার গাজীপুর থেকে আসেন।[১] কবির পিতা কাজী সাহেবের দুই বিবাহ।[২] নজরুল তাঁর পিতার দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র। নজরুলের সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ১। নজরুল দুই ভ্রাতার মধ্যবর্তী। নজরুলকে ছোটবেলায় পড়াশুনা করতে হয়েছে গ্রামের মক্তবে। তাছাড়া বছর আট বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়ে গেছে তাঁর। ফলে বাউণ্ডুলে; ছন্নছাড়া স্বভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল ছেলেবেলা থেকেই। দুই মাতার পুত্র-কন্যার মধ্যে (সাত পুত্র, পাঁচ কন্যা নজরুলের পিতার দুই স্ত্রীর) সংসারে থেকে বেড়ে ওঠার ব্যাপারটাও তাঁর এই ছন্নছাড়া উদাসীনতার পেছনে থাকা অসম্ভব নয়। লেটোর দলে যুক্ত হয়ে পড়া [বালক

নজরুল যখন লেটোর দলে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে, যাত্রা নাটক করে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় বাংলাদেশের মাতৃসাধক মুকুন্দ দাসও দেশাত্মবোধ জাগাবার ব্রত নিয়ে গান ও যাত্রা লিখে বরিশাল জেলার ঋষিকল্প অশ্বিনী দত্তের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী যাত্রা করে দেশে জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুকুন্দদাস নজরুলের অনেক গান তাঁর স্বদেশী যাত্রায় গ্রহণ করে গেয়েও গেছেন।] ও আসানসোলে রুটির দোকানে ৫/৮ টাকার বেতনে চাকরী (প্রসঙ্গত স্মরণীয় মানবদরদী ম্যাক্সিম গোর্কীর জীবনেও রুটির দোকানের ছোকরা কর্মীর অভিজ্ঞতা আছে) কিংবা রাণীগঞ্জে রেলের গার্ড সাহেবের বাবুর্চির কাজ—এসবের জন্য তাঁর পারিবারিক জীবনের অশান্তি ও আর্থিক অনটনই দায়ী।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। নজরুলের বয়স ১০। গ্রামের মক্তব থেকে পাশ করলেন নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা। আর ঐখানেই শুরু করলেন শিক্ষকতার কাজ। বিংশ শতকের প্রথম দশক নজরুলের কৈশোরকাল। অপরিচিত, অবজ্ঞেয়, অখ্যাত নজরুল। শিক্ষা, আশ্রয় ও সঙ্গতির অভাবে একাকী জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলার রাজনৈতিক আকাশ স্বদেশী-আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের মত বিশাল ব্যাপারে তরঙ্গিত, উত্তাল। নজরুলের ছাত্রজীবন সেই আলোড়নকারী ঘটনার দ্বারা কতখানি বিচলিত হয়েছিল তার কোনো বিস্তৃত তথ্য আমাদের জানা নেই। কেবল 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সংযুক্ত নজরুলের শেষ দিককার শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গে তার সংযোগের সংবাদ ছাড়া। তবে সে খবর এই মুহূর্তের নয়। গ্রামের মক্তব ছেড়ে নজরুল লেটোর দল, রুটির কারখানায় চাকরী ইত্যাদি করে বেড়ালেন। শেষে এক সহৃদয় পুলিশ অফিসারের দয়ায় তাঁর দেশের (ময়মনসিং / কাজীর শিমলা গ্রাম) দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। কয়েকমাস মাত্র। তারপর মাথরুন হাইস্কুল। কুমুদরঞ্জন শিক্ষক ছিলেন সেইখানে। তারপর রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল হাইস্কুলে। একটানা তিন বছর ছাত্র ছিলেন এখানে নজরুল। সুবিধে ছিল, রাণীগঞ্জ রাজার দেয় বৃত্তি মাসিক ৭ টাকা। আর পড়া খরচ ও বোর্ডিং ফ্রি। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার এই সুযোগ পাবার মূলে। তবু নজরুলের পড়া হোল না।৫

১৯০৯-১৯১৭ (দশম শ্রেণীর ছাত্র) সাল নজরুলের ছাত্রজীবন। অবিচ্ছিন্ন নয়। নানান প্রতিকুলতায় ছিন্নভিন্ন। যার মূল ছিল আর্থিক অসচ্ছলতা ও

সম্ভবত পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ। তবে স্বীকার করতে হবে এই আট বছরে নজরুলের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে উঠেছে বিচিত্র সব ঘটনায়। বিভিন্ন মানুষ ও পরিবেশ নজরুলকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের জগৎ অনেকখানি ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে এই ক বছরের মধ্যে। দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টারা সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন রীতিমত দক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্ববন্দিত করে তুলেছেন। নোবেল পেয়েছেন তিনি (১৯১৩)। 'গোরা' তো নোবেল পাবার আগেই প্রকাশিত। পরে পরে স্বদেশচেতনা ও ঐতিহ্যপ্রীতিতে নানান প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লেখা হয়েছে তাঁর।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে এরই মধ্যে। বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর বিরোধ দেখা দিয়েছে। কার্জনের ইউনিভার্সিটি আইন পাস হয়েছে। দেশের বিদ্বৎসমাজ এর বিরোধিতা করেছেন। অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক হোমরুল লীগ স্থাপিত হয়েছে। গান্ধীজী প্রত্যাবর্তন করেছেন ভারতে। দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। জাতীয় আন্দোলন হয়েছে জোরদার। বাংলায় বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু। আমেরিকায় গদর পার্টি ও জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের 'যুগান্তর' দলের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সঙ্গে রাণীগঞ্জ শিয়ারশোল স্কুলের ছাত্র নজরুলের যোগাযোগ ঘটেছে।[৫] নজরুলের জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সানইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে মহাচীনের নবজাগরণ ঘটেছে। শুরু হয়েছে প্রথম মহাসমর (১৯১৪)। বাংলাদেশে 'সবুজপত্র', 'নারায়ণ', 'ভারতবর্ষ, মাসিক পত্রিকা এই বছরে প্রকাশ পেলো। সম্পাদনায় যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ে এবং তার কয়েক বছর আগে থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে। তার কারণ ছিল। দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সরকারী বৈষম্য ও ঐসব চাকুরীক্ষেত্রেও অসম ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ মেধাবী যুবকেরা ১৮৭০-এর পর থেকেই সরকারী চাকুরীর মোহের বন্ধন ছিন্ন করে সংবাদ-

পত্র সম্পাদনা বা শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। মুদ্রাযন্ত্রকে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশের বাহন করে তোলেন। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের মতন। ফলত শুরু হোল ইংরেজ সরকারের দমননীতি। সংবাদপত্রও যে কোন পত্রিকাকে যে কোন সুযোগে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবার চেষ্টা চললো।৬

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হল (১৯১৭)। নজরুল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন না। সৈন্যবিভাগে যোগ দিলেন তিনি। দেশের পরাধীনতা ছাত্রজীবন থেকে নজরুলকে পীড়িত করছিল। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পেছনে ছিল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণের ভাবনা। এরকম সংবাদ তাঁর সহপাঠী (সতীর্থ নয়) শৈলজার৭ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও একথা বলেছেন।৮ নজরুলের সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণের কথা শৈলজার রচনায় উপন্যাসোপম সৌন্দর্য পেয়েছে। দেশকে স্বাধীন করা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ-শিক্ষা ইত্যাদির ভেতর উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন সৈন্যবাহিনীতে নজরুলকে যেতে হয়েছিল অন্নসংস্থানের জন্য। চাকরী করতে। আর বাংলা দেশের তথা কোলকাতার মাটিতে চাকরীর অনুসন্ধান না করে, স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে চাকরী নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই এক রোমান্টিক মন ক্রিয়া-শীল নজরুলের। এক প্রেম-প্রত্যাখ্যাত বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা। (এ প্রেমের নায়িকা অবশ্যই সেই প্রেমিকা যাঁর মাথার কাঁটা সৈন্যবাহিনীতে যাবার সময় নজরুলের সঙ্গে ছিল) 'বাঁধনহারা' পত্র উপন্যাসের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানকারী নায়ক (নুরুল হোদা) নুরুর জীবনবৃত্তির সঙ্গে তার স্রষ্টারও সুনিশ্চিত যোগ এই সূত্রে মনে পড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে, মানে সৈন্যবাহিনীতে থাকা-কালে নজরুলের লেখা বিভিন্ন গল্পের নায়কেরা ব্যথাহত ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এর মূলেও নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব ক্রিয়াশীল। (প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, নজরুলও নিজের নুরু নাম পছন্দ করতেন। নজরুলকে যারা ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন তাঁরা নজরুলের নুরু নাম ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন চিঠিতেও নজরুল 'নুরুদা', 'নুরু' স্বাক্ষর করেছেন) এই মানসিক অবস্থাতে সৈন্যবাহিনীর কঠোর জীবনে থেকেও ব্যথার দানের রোমান্টিক প্রেমকথা রচনা অসম্ভব নয়।

নজরুল সৈন্যবাহিনীতে। করাচিতে। কিন্তু কোলকাতায় তাঁর পরিচিতি ঘটে গেছে কিছু কিছু সাহিত্যিক মহলে। সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে নজরুলের

প্রকাশিত লেখালেখির একটা তালিকা করা যেতে পারে। (যদিও এ তালিকা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল এমন দাবী করা ঠিক নয়)

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনা	শ্রেণী
১৯১৯ (১৩২৬)	জ্যৈষ্ঠ	সওগাত	বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী	গল্প
১৯১৯ (১৩২৬)	শ্রাবণ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	মুক্তি	কবিতা
১৯১৯ (১৩২৬)	ভাদ্র	সওগাত	স্বামীহারা	গল্প
১৯১৯ (১৩২৬)	আশ্বিন	সওগাত	কবিতাসমাধি	কবিতা
১৯১৯ (১৩২৬)	কার্তিক	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	হেনা	গল্প
১৯১৯ (১৩২৬)	পৌষ	প্রবাসী	আশায়	কবিতা/অনুবাদ
(১৯২০ ?) (১৩২৭)	মাঘ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	ব্যথার দান	গল্প
(১৯২০ ?) (১৩২৭)	ফাল্গুন/চৈত্র	নূর	ঘুমের ঘোরে	গল্প
(১৯২০ ?) (১৩২৭)	বৈশাখ	নূর	রিক্তের বেদন	গল্প
১৯২০ (১৩২৭)	মাঘ	নূর	মেহেরনেগার	গল্প
১৯২০ (১৩২৭)	মাঘ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	সাঁঝের তারা	গল্প

এ তালিকা থেকে স্পষ্ট একথা—নজরুল প্রথমে গল্পকার পরে কবি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা গল্প। বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী। আর তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা মুক্তি। বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী রিক্তের বেদন গল্পসংকলনের অন্তর্গত হয়ে অনেক পরে (ডিসেম্বর ১৯২৪) গ্রন্থভুক্ত হয়।

বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা হলেও গল্পটিতে নজরুলের বর্ণনাভঙ্গি, ভাষা ও শব্দপ্রয়োগের তির্যকতা, জড়তাহীন বেগবান বাক-বন্ধ, অনুষঙ্গ প্রয়োগের বিশিষ্টতা সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি ও প্রয়োগের নিজস্বতা আমাদের সচকিত করে দেবে। বিষ্ণু দে'র হাতে রবীন্দ্রনাথের তির্যক প্রয়োগ দেখে৯ নিতান্ত একালের পাঠক আমরা সবিস্ময় প্রশংসা করি। আর বিশ বছরের নজরুল লিখেছেন :

বাস্তবিক সেরকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি। চপেটাঘাত, মুষ্ট্যা-ঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাতপায়ের যতরকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত

হয়েছে সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষায় "শ্রাবণের ধারার মতো" পড়তে লাগল "আমার মুখের পরে, পিঠের পরে।"১১

"মুক্তি" নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাহিনীধর্মী এক কবিতা। অসম পাবিক অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত স্বরবৃত্তে লেখা কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের পলাতকা (১৯১৮)-র একই আঙ্গিকের কবিতাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে প্রায় এক বছর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা 'কবি যশপ্রার্থী' নজরুলকে এতখানি প্রভাবিত করেছিল যে, পলাতকার পরীক্ষামূলক ছন্দ প্রায় অবিকল দক্ষতায় অনুসরণ করে ১০৬ পংক্তির কবিতা লিখে ফেললেন তিনি।

এই কবিতার প্রথম নাম (কবি কর্তৃক দেওয়া) 'ক্ষমা'। সম্পাদনার সময় সম্পাদক মহম্মদ শহীদুল্লাহ (?) কবিতাটির বর্তমান নামকরণ করেন,১১ নতুবা মুজফ্ফর আহম্মদ. এ ব্যাপারে মুজফ্ফর আহম্মদের বক্তব্য স্বচ্ছ নয়। কবিতার 'মুক্তি' নামটিও পলাতকার অনুষঙ্গ নিয়ে আসে সহজেই। প্রসঙ্গতঃ ভাবতে হয়, 'নজরুল পরিক্রমার' লেখক আজীজ আল আমান সাহেব তথ্য দিয়েছেন যে কবিতাটি ১৯১৬-র এপ্রিলে নজরুলের ছাত্রজীবনে লেখা।১২ তাই যদি হয় তবে তো পলাতকার ছন্দচর্চার আগেই নজরুলের এই কবিতা। অথচ আমান সাহেব পরক্ষণেই বলেছেন, "পলাতকার সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দের অনুকরণ",. এ কবিতায় সুস্পষ্ট। বক্তব্যটি পরস্পর-বিরোধী। যতদূর মনে হয়, মুজফ্ফর আহম্মদ সাহেবের পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাটির নামের পাদটীকায় নজরুলের একটি মন্তব্য আছে। "১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিতরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে".৪—এই অংশটি অবলম্বন করেই আমান সাহেব অনুরূপ অসতর্ক মন্তব্যে কবিতাটির রচনা, তারিখ ও মাস ব্যবহার করেছেন। 'নজরুল কাব্য পরিচয়' গ্রন্থেও মধুসূদন বসু অনুরূপ বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেছেন।.৫ তবে পলাতকার কবিতা পাঠের আগে যে নজরুল এমন কবিতা লিখতে পারেননি এটাই সঙ্গত চিন্তা।

'মুক্তি' কবিতা নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হলেও এর পূর্বে নজরুল ছাত্রজীবনে কবিতা লেখায় যে হাত পাকিয়েছিলেন তার তথ্য দিয়েছেন কবি-বন্ধু শৈলজা।১৬ তবুও বলা যায় মুক্তি কবিতাটিতে উচ্চমানের কাব্যসৌন্দর্য তেমন নেই। তবে কবিতাটির শেষাংশে যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া আছে তা নজরুলের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি নিহিত আকর্ষণের প্রমাণ।

সওগাতে ছাপা 'স্বামীহারা' গল্পটি পূর্বোক্ত রিক্তের বেদন গল্প সংকলনের

অন্তর্গত। গল্পটি এক বিধবা নারী বেগম-এর মর্মন্তুদ কাহিনী। বেগমের শূন্যতা বোধের প্রকাশে গল্পটিতে প্রকৃতি ও কাব্যপ্রীতির অপূর্ব সংযোগ। শিক্ষিত মুসলমান নারী বেগমের কাব্যপ্রীতি তথা রবীন্দ্রমনস্কতা মূলত নজরুলেরই ব্যক্তিমনের প্রতিচ্ছবি। তবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নারী চরিত্রের মনোভূমির এ এক নতুন তথ্য। নজরুলেরই নিজস্ব সংযোজন। আমরা আশ্চর্য হই, যখন নায়িকার বক্তব্যে পাঠ করি, "এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন যে দিন শেষ হয়ে এল, ঐ শুন নদী পারের বিদায় গীত শুনা যাচ্ছে খেয়াপারে ক্লান্ত মাঝির মুখে ঃ

"দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের এমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার আমাদের আনন্দিত করে। অন্যদিকে ইসলামিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবনের নশ্বরতার চিন্তা বেগমের ভাবনায় সঞ্চার করেছেন লেখক—

"শুনেছি যে জায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের পয়দা করেন, নাকি সেই জায়গাটিতেই আমাদের কবর হয়। আর তাই আমরা স্বতঃই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। এখন তাহেরার কবরটি যেমন ধ্বসে গেছে আর ওর মধ্যে একটা ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়তো সে কতবছর বাদে আমারও কবর এরকম ধ্বসে যাবে। আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ-মূর্তিতে প্রকট হয়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে।" [১৮]

মুসলমান সমাজের নেকা বা দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে এ গল্পে নায়িকার বক্তব্যে। যেখানে মৃত স্বামীর প্রতি পবিত্র ভালোবাসা অতন্দ্র সেখানে দ্বিতীয় বিবাহের যৌক্তিকতা নেই। নায়িকার এই জাতীয় চিন্তার জন্য (মুসলমান সমাজের) মৌলভীদের বিরুদ্ধাচারণ স্মরণে রেখেই নায়িকা বলে ঃ

"মৌলভী সাহেবরা হয়তো একটু চটে আমার জানাজার নামাজই পড়বেন না। কিন্তু মানুষ আর মৌলভীতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয়ে অনেক তফাৎ।"[১৯]

নজরুল জীবনের প্রথম পর্বের রচনাতেই মৌলভী সাহেবদের প্রতি তাঁর এই বীতরাগ। ক্রমশঃ এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে নজরুলের জীবনে। মুসলমান সমাজব্যবস্থায় যে শাস্ত্র বচনের আক্ষরিক ও নির্মম অনুসরণ-এর ব্যাখ্যাদাতা মৌলভীদের প্রতি নজরুলের কটূক্তির সূচনা বোধ হয় এই গল্পটিতে। পরবর্তী-কালের বিভিন্ন ভাষণ ও কবিতায় মুসলমান সমাজ প্রসঙ্গে যখনই কোনো

প্রোগ্রেসিভ চিন্তার প্রচার করেছেন নজরুল তখনই মৌলভীদের এই নির্মম ও নীরস শাস্ত্রানুসরণের নিন্দা করেছেন তিনি। ১৯১৯ আশ্বিনের সওগাতে ছাপা।২০ 'কবিতাসমাধি' রচনাটি একটি হাস্য রসের কবিতা। আকৃতিতে হ্রস্ব। এই কবিতাটি নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড / হরফ ১৯৮১ / পৃঃ ২২৮-এ প্রাপ্তব্য।

'হেনা গল্পটি বর্তমানে ব্যথার দান গল্প সংকলনের অন্তর্গত। ব্যথার দান নজরুলের 'বিখ্যাত' হয়ে ওঠার পরে প্রকাশিত। ১৯২২-এর ফাল্গুনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতাটি প্রকাশিত হলে উৎসাহী নজরুল হেনা গল্পটি পাঠিয়ে দেন ঐ পত্রিকায়।

গল্পটি এক আফগান যুবকের আবেগতপ্ত প্রেমের ইতিহাস। গল্পটির নায়ক সেই। সোহরাব তার নাম। এ গল্প সেই সৈনিকের দিনলিপিরূপে লিখিত। আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য নজরুলের গীতি-কবিতাধর্মী গল্পপদ্ধতির সহায়ক হয়েছিল নিঃসন্দেহে। সুদূর ফ্রান্স, জার্মান, বেলুচিস্তান, পেশোয়ার, কাবুল থেকে যেন লিখিত এ গল্পের কাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চের মধ্যেও লিখিত হয়েছে এর দিনলিপি। বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান বাঙালী প্রাণের কাছে এজাতীয় গল্প অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছিল। যুদ্ধের রোমাঞ্চকর পরিবেশে এক সৈনিকের অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি-প্রবণ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে এ কাহিনীতে। এই গল্পের নায়কের বক্তব্যের পেছনেও সৈনিক নজরুলের ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতার অসাধারণ সামঞ্জস্য বারবার ছোট গল্পের সীমানা থেকে লেখকেরই বন্ধুর অন্তর্লোকে পাঠককে আকর্ষণ করে।

'হেনা' গল্প প্রকাশের পরের মাসে ছাপা হল 'আশায়' নাম দিয়ে হাফিজের ভাব নিয়ে লেখা ছ লাইনের একটি কবিতা 'প্রবাসী'তে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে' কবিতাটি ছাপা হয়নি।২১ এই কবিতা প্রসঙ্গেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নজরুল লিখেছিলেন :

"প্রবাসীতে বেরিয়েছে 'সবুজপত্র'-তে পাঠানো কবিতা, এতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্যাদা একটুও কম নয়। প্রচার আরো বেশী, তাছাড়া আমি কবিতা লিখেছি পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণকুন্তলের যে মৃদুগন্ধের সন্ধান আমি

পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাঙ্গলার কথা……কত শত বছর আগের পারস্যের কবি আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যু সমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায় আপনজন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই একটুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দূর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙ্গালীর সচেতন মনে মানুষের ভাব জীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছে দেবার ও যোগ্য বাহনে পরিবেশন করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার।"[২২] এর পর থেকেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে[২৩] এবং প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গেও।

প্রবাসীর সঙ্গে এ সম্পর্ক ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল নজরুলের প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিয়ে করার আগে পর্যন্ত টিকেছিল বলা চলে। ব্রাহ্ম পরিচালিত এই পত্রিকা। নজরুলের এই বিবাহে তবু তাঁরাও ক্ষুব্ধ হন। এবং প্রবাসীতে নজরুলের লেখা ছাপা বন্ধ হয়ে যায়।[২৪] তারপর মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে নজরুলের ভুল বোঝাবুঝির ফলস্বরূপ ব্রাহ্মবিদ্বেষী মোহিতলাল ও প্রবাসীর সঙ্গে আর ঐ বছর (১৯২৪) জুলাই-এ প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ও নজরুলের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ করতে থাকে।[২৫] অবশ্য এ সব সংবাদ একটু পরের।

প্রবাসীতে 'আশায়' কবিতা প্রকাশের পরের মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয় 'ব্যথার দান' গল্প।

ব্যথার দানের নায়ক দারা। নায়িকা বিদৌরা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চরিত্র সয়ফুল মুলক। প্রত্যেক চরিত্র এখানে ব্যক্তিগত কথা বলেছে। আঙ্গিকের দিক থেকে রজনী বা ঘরে বাইরের (১৯১৬) উত্তরসূরী ব্যথার দান।

এই ছোট গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আবেগের আতিশয্যে আবৃতপ্রায়। চরিত্রগুলি একঘেয়ে রোমান্টিকতার সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত। আসন্ন কল্লোলীয় (১৯২৩) বোহেমিয়ান জীবনবোধ দারার মধ্যে বর্তমান। বিশ্বাসঘাতিনী মানসীকে ক্ষমা করতে না পেরে এক গভীর বিরহব্যথা নিয়ে গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী সৈনিক দারা নিজের দেশ গোলেস্তান থেকে সুদূর হিন্দুস্তান পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু স্মৃতির প্রদাহ তাকে আজও জ্বালায়। বিদৌরা 'ব্যথার দানের রোমান্টিক

এক নারী, নায়িকা। নজরুলের ব্যক্তিগত প্রথম প্রেমের অ-লিখিত সমস্যার লিখিত রূপ বোধ করি বিদৌরার আত্মকথা। বিদৌরার জীবনে যে সমস্যা তা সামাজিক ও রোমান্টিক নারীর মিলিত সমস্যা। একজনকে দিয়েছে সে মন, অন্যজনকে দেহ। অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্বে সংযত থাকতে পারেনি নারী বিদৌরা। একদিকে প্রেমের অন্তহীন অশান্তি, অন্যদিকে কামনার দারুণ দহন। পুষ্পিত যৌবনের ভারে অসহায় বিধ্বস্ত বিদৌরা ধরা দিল দারার নয়, অন্যজনের কামনায়। নিজের ও অন্যের কামনার কাছে আত্মদানই বিদৌরার অন্তর্যাতনার মূলে।

সমস্যাটা শরৎচন্দ্রীয় নিঃসন্দেহে। কেবল স্বতন্ত্র পাত্রপাত্রীর মর্মবেদনা প্রকাশের ধরন, ভঙ্গী। বলা বাহুল্য ১৯১৯ এর আগে পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের দেবদাস (১৯১০), বিরাজ বৌ (১৯১৪), বড়দিদি (১৯১৬), শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (১৯১৮)—সমাজের নিষিদ্ধ প্রেমনির্ভর ছ'খানা উল্লেখ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে; [তাছাড়া প্রকাশিত হয়ে গেছে বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা (১৯১০), বৈকুণ্ঠের উইল, মেজদিদি (১৯১৫), পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া (১৯১৬), পণ্ডিতমশাই, নিষ্কৃতি (১৯১৭)] সাহিত্য-বিষয়ে উৎসাহী নজরুলের এসব পড়ে ফেলা স্বাভাবিক।২৬

তবে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মৌনমূক স্বগত যাতনা অনেক সময় কেবল তপস্বিনীর শুভ্রতার আড়ালে আবৃতপ্রায়। তুলনায় হিন্দু নয়, মুসলমান নারী বিদৌরা তার অধঃপতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কথা বলে কিন্তু বিদৌরা অন্তরের দ্বিধাকে অতিক্রম করে ফিরে যেতে পারে না দারার কাছে। আবার বাংলা সাহিত্যের নষ্টনারীর ওপর শরৎচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য দারার কথা থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে শান্ত মানসিকতায় বিদৌরা একদিন ফুল ও গানের মালায় বরণ করবে দারাকে। একদিন বিদৌরাকে ক্ষমা করতে তার কাছে পৌছাবে দারা। সায়ফুল মুলক, দারা এবং বিদৌরার পবিত্র প্রেমের বিনষ্টির মূল। কিন্তু বিদৌরা তাকে যতটা নীচ ভাবে সে যে তা নয় তা প্রমাণ করে সে; বিদৌরার কাছে ক্ষমা চাওয়ায় এবং আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানে, দারার হতভাগ্য জীবনের প্রতি গভীর ও যথার্থ সমবেদনায়। সায়ফুল মুলককে দারা ক্ষমা করেছে। দারা ক্ষমা না করলেও বোধ করি তার মহত্ত্ব ম্লান হোত না। অন্যদিকে যুদ্ধে আহত অন্ধ দারা ক্ষমা করেছে বিদৌরাকেও। কিন্তু এ ক্ষমা যতখানি

রোমান্টিক, ততখানি বাস্তবিক নয়। বিদৌরাকে ক্ষমা করেও, দেহমন, 'অন্তর বাহির', প্রেমকামের দ্বন্দ্বে সুচিন্তিত সমাধান ঘোষণা করেও সে বলে :

"দেখ বিদৌরা আজ আমাদের শেষ বাসর শয্যা হবে। তারপর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নির্ঝরটার ওপারে আর আমি থাকব এপারে। এই দু'পারে থেকে আমাদের দু'জনেরই বিরহগীতি দু'জনকেই ব্যথিয়ে তুলবে। আর এই ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরো বড়—আরো বড় করে পাবো।"[২৭]

এ তো ছোটগল্পের উপসংহার নয়। কবি নজরুলের অজস্র গীতিকবিতা (যা তখনও সৃষ্টি হয়নি)-র বিস্তৃত মুখবন্ধ, যে সব কবিতায় বারবার সেই আবেগময় উচ্চারণ শুনি :

আমি এপার তুমি ওপার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার[২৮]
হে মোর প্রিয়
হে মোর নিশীথরাতের গোপন সাথী
মোদের দু-জনারই জনম ভরে কাঁদতে হবে গো
শুধু এমনি করে সুদূর থেকে একলা জেগে রাতি।[২৯]

'ঘুমের ঘোরে' ব্যথার দানের পরবর্তী প্রকাশ। গল্পের নায়ক আজহার। আফ্রিকার সাহারা মরূদ্যান সন্নিহিত ক্যাম্প থেকে লিখছে তার মনের ব্যাকুল বেদনা। ডায়েরী লেখার ভঙ্গীতে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এই গল্পটির সঙ্গেও যুক্ত।

জীবনযুদ্ধে বিক্ষত প্রাণের মর্মন্তুদ যাতনা, যাতনার বহিঃপ্রকাশ এই কাহিনীর উৎস। জীবনে আঘাত পেয়ে আশ্রয়হারা এক মানুষ সর্বশেষে আশ্রয় চাইছে খোদার কাছে।

পরী এ গল্পের নায়িকা। পরী ও আজহারের প্রণয়ের পটভূমিতে নিবিড় কাব্যিক পরিবেশ বর্তমান। পরীর অনুরাগের শঙ্কিত শিহরণ ও প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুর কাঠিন্য, আজহারকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। পরীর স্বামী আজহারের বন্ধু পরী ও আজহারের প্রেম-সম্পর্ক সব কিছু জেনেও পরীকে সসম্মানে গ্রহণ করেছে। পরী এতে স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী বর্ণনায় মুখ্যত নজরুলই সমকালে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ

-ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রেম অভিজ্ঞতা বর্তমান। আর সেই কারণে তাঁর এই সব গল্প আঙ্গিকগতভাবে ডায়েরী-ধর্মী, পত্রধর্মী অথবা স্মৃতি রোমন্থন মূলক।৩০

সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন নজরুলের এইসব রচনাই ছাপা হয়েছে। প্রবাসীতে ছাপা একটি অনুবাদ (হাফিজ) কবিতা বাদে বাকী সব কটি লেখাই মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় এবং সেইসব পত্রিকার তেমন সার্বিক জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি নেই। বলা বাহুল্য, লেখক হিসেবে নজরুল তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেননি তখনো বাংলাদেশে। কেবল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় লেখা পাঠানো মারফৎ মুজফ্‌ফর আহম্মদ প্রমুখের সঙ্গে কিছু পত্র লেখালেখি ও যোগাযোগ হয়েছে। ইত্যবসরে ১৯২০-এর গোড়ার দিকে ছুটিতে এসে নজরুল একবার কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহম্মদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলেন।৩১

মার্চ-এ নজরুলের ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল। নজরুল বন্দুক নামিয়ে কলম ধরলেন। আশ্রয় নিলেন মুজফ্‌ফর আহম্মদের পরামর্শে কলকাতায়। প্রথমে শৈলজানন্দের মেসে, সেখান থেকে 'মুসলমান' নজরুলকে আস্তানা খুঁজে উঠতে হোলো বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে, মুজফ্‌ফর আহম্মদেরই কাছে।৩২

১৯২০ সালের বৈশাখে নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গল্প ছাপা হল 'নূর' পত্রিকায়। বৈশাখেই প্রথম প্রকাশিত হল 'মোসলেম ভারত'। প্রথম সংখ্যায় ছাপা হল নজরুলের পত্রোপন্যাস বাঁধনহারার প্রথম কিস্তি। [এরপর পৌষ বাদে মাঘ পর্যন্ত মোসলেম ভারতে এই উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। যদিও প্রকাশকালে মাঘ সংখ্যার তিনটি পত্রই বর্জিত। এবং নতুন দুটি পত্র ও অবশিষ্ট রচনা নিয়ে উপন্যাসটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। আজীজ আল আমান সাহেব তাঁর সম্পাদিত (হরফ) নজরুল রচনা সম্ভার ২য় খণ্ডের পুস্তক পরিচিতি অংশে বর্জিত তিনটি চিঠিই ছেপে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক দেখে নিতে পারেন।] শ্রাবণে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'অতৃপ্ত কামনা' এবং মোসলেম ভারত-এ 'বাদলবরিষণে'। এ দুটিও গল্প।

'রিক্তের বেদন' গ্রন্থাকারে আরো ৭টি গল্প নিয়ে ১৯২৫-এ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৪-এর বড়দিনে লেখা 'নিবেদন' অংশ পড়ে গ্রন্থটিকে ১৯২৪-এ প্রকাশিত ভাববার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, 'রিক্তের বেদন' ডায়েরী-ধর্মী লেখা। শৈলজানন্দ যেভাবে নজরুলের যুদ্ধে যাবার ইতিকথা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আমার বন্ধু নজরুল'-এ, এ গল্পে যেন তারই তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক বর্ণনা। এ-গল্পে উল্লিখিত স্থান ও সময় সাজানো হয়েছে এইভাবে: বীরভূম, সালার, রেলপথে (অণ্ডালের কাছাকাছি), রেলগাড়ী (নিশিভোর), ঐ প্রত্যূষে, লাহোরের অদূরে (নিশীথ), নৌশেরা, কুর্দিস্তান, কারবালা, আজিজিয়া, কুতল আমরা (শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি)। করাচী (মেঘম্লান সন্ধ্যা—সাগরবেলা) গল্পে উল্লিখিত সমস্ত জায়গায় নজরুল অবশ্য যাননি। ভারত তথা করাচী ও নৌশহরার বাইরেই যাননি তিনি।৩৩ কিন্তু নিজস্ব শক্তিশালী কল্পনায়—নিশ্চয়ই আরবের কারবালা প্রভৃতি এলাকা (যেদিকে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর যাবার কথা ছিল ও অনেকে গিয়েও ছিলেন)-র পরোক্ষে প্রাপ্ত ভূ-প্রকৃতির তথ্যের আশ্চর্য রম্য-ভাষারূপ৩৪ দিয়েছেন তিনি:

"আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে মেঘমুক্ত শুভ্র জ্যোৎস্না পড়ে তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে। এ দেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ করবার জিনিস! পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র আর প্রখর নয়। দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে—এগুলি জ্যোৎস্নালোকে তোলা ফটো।৩৫

(কেবল রিক্তের বেদনে নয়, ব্যথার দানের অন্তর্গত আরও কয়েকটি গল্প কিংবা একটুপরে লেখা শাত-ইল-আরব বা 'ফতেহা-ই-দোয়াজ দহম, আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি কবিতায় যে ভূগোল পাই সেই সব বর্ণনায় বাস্তবতা ও সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠে না। এগুলিকে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার বর্ণনা বলেই মনে হয়।)

'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক তার বুকের ভেতর প্রাক-সৈনিক জীবনের প্রিয়া শহীদার স্মৃতিটুকুও বিসর্জন দিয়ে বীর, রিক্ত ও মুক্ত হবার সাধনা করছে। তার স্বগত চিন্তা:

"যার প্রাণের গোপনতলে এখনো কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবী করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্যে প্রাণ দেবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ!"৩৬ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ মনে পড়ে যেতে পারে আমাদের। কিন্তু রিক্তের বেদনের সুরই ভিন্ন।

এই জিতেন্দ্রীয় নায়কের জীবনে আবার আসে প্রেম। এক বেদুইন নারী (গুল)-র শক্তিমান কামনার আকর্ষণে বিক্ষত ও পর্যুদস্ত হয় নায়কের যুবন হৃদয়। তার শক্তিমান উদ্দাম স্বাধীন প্রণয় জয় করে নিল নায়ককে অবশেষে। কিন্তু খোদাকে ধন্যবাদ দেয় নায়ক এই বন্ধনও সে ছিন্ন করতে পারলো বলে। অতঃ পর এই বন্ধন ছিন্নের ইতিহাস গল্পটির উপসংহারকে অশ্রু, রক্ত ও স্নেহের উত্তাপে দুঃসহ সুন্দর করে তুলেছে।

১৯২০-এর বৈশাখে 'মোসলেম ভারত' নতুন পত্রিকা, উঠতি লেখক নজরুলের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। 'বাঁধনহারা' পত্র উপন্যাসের প্রথম কিস্তি ছাপা হল, যেগুলি সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালেই নজরুল লিখে রেখেছিলেন। ১৯২৭-এ বাঁধনহারা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস বলা যেতে পারে। গ্রন্থের নায়ক নুরুল হুদা তথা নুরু সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত। তার গ্রাম দেশের যে জীবন স্মৃতি হয়ে তাকে জড়ায় তার সেই জীবনের সঙ্গে পত্র-সূত্রে পরিচয় ঘটে যায় পাঠকের: নুরুল হুদা, নুরুর বন্ধু রবিয়ল, রবিয়ল-এর মা, মনুয়র, রবিয়ল-এর স্ত্রী রাবেয়া, মহবুবা, সোফিয়া এবং সাহসিকা প্রভৃতি চরিত্রের পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের ভেতর দিয়ে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত, আবেগময়, স্নেহপ্রবণ। নুরুর জন্যে উদ্বেগাকুল অনুভূতিতে প্রাণবন্ত ও রক্তমাংসময়।

এই জাতীয় উপন্যাসের যেটা সবচেয়ে বড় ত্রুটি, তা হল: যেহেতু সব চিঠিগুলির স্রষ্টা এককভাবে লেখকই তাই, প্রত্যেক চরিত্রের ভাষা, মেজাজ ও মর্জি একই রকম হয়ে পড়ে। ফলে অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতা উপন্যাসকে গ্রাস করতে পারে। নজরুল আশ্চর্য দক্ষতায় এ ত্রুটি থেকে উপন্যাসকে মুক্ত রেখেছেন। নুরুল হুদার সুতীব্র আবেগদীপ্ত পুরুষালি বাকবন্ধ, সোফিয়ার স্বগত প্রেমময়ী ও স্নেহাতুর নারী হৃদয়, রাবেয়ার সহজ পরিহাস-উজ্জ্বল সহানুভূতিময় ভাবনা, মেহবুবার সইসুলভ কথাবার্তা (সোফিয়াকে), মনুয়রের বন্ধুসুলভ চপল সহৃদয়তা —সবই স্বতন্ত্র ও সম্ভাব্য বলে মনে হয় আমাদের।

সমকালীন কথাসাহিত্যের ধারায় 'বাঁধনহারা' নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট হবে তার বিশেষ Style-এর জন্য। কথা সাহিত্যের মধ্যে আবেগান্দোলিত হৃদয়চিত্র অঙ্কন ও মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে অগ্রাহ্য নয়, অতিক্রম করে তীব্র জীবনাবেগে কাহিনী-কথন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় গদ্যশিল্পশৈলীরই প্রমাণ। চলতি 'স্ল্যাং' ব্যবহারের যে পরীক্ষা সাম্প্রতিককালে প্রফুল্ল রায় তাঁর কথাশিল্পের গদ্যশৈলীতে

চালাচ্ছেন (আমাকে দেখুন ১, ২ পাঠ্য) তার অনেক আগে নজরুল অবলীলায় বাঁধনহারায় তার ব্যবহার করেছেন।

বাঁধনহারার অনেক পরবর্তীকালে (১৯৪৪) বুদ্ধদেব বসু নজরুলের গদ্যশৈলী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "গদ্য লেখক হয়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতি মুখর মনের অসংযত বিশৃংখলা সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে সে তো অনিবার্য।".৮ নজরুলের সমকালীন বয়ঃকনিষ্ঠ, নজরুলের চেয়ে অনেকগুণে বিদগ্ধ কবি-সমালোচকের এই উক্তি থেকে নজরুলের গদ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথেষ্ট নেতিবাচক হয়ে উঠবে। কিন্তু ব্যথার দানের গল্প, বাঁধন হারা, কুহেলিকা কিংবা মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের নিবিষ্ট পাঠক ঠিক ততখানি হতাশ হবেন না। আর বুদ্ধদেবের নিজের কাব্য-ধর্মী উপন্যাস ও গল্পগুলির মধ্যে যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে সেই ধারায় নজরুলের পূর্বোক্ত রচনাগুলিই বাংলা কথা সাহিত্যের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত। পদ্যেও যেমন (মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা) গদ্যেও তেমনি নজরুলকে অবলম্বন করেই বুদ্ধদেব হাত পাকিয়েছেন। 'রজনী হোলো উতলা' বা তার পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'ভালো আমার ভেলা'র অনেকগুলি গল্প, 'সাড়া' কিংবা 'যেদিন ফুটলো কমল'-এর মত উপন্যাস-এর গদ্যশৈলীর মধ্যে যে আবেগসর্বস্ব কাব্যময়তা আছে তার পশ্চাতপট তো নজরুলেরই রচিত। অথচ দুঃখ এইখানে যে, নজরুলের গদ্যশৈলী সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্যে ঋণ স্বীকারের শোভনতা নেই। অথচ সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনরকম অভিজ্ঞতা না রেখেও বুদ্ধদেব ঐ প্রবন্ধেই নজরুলের সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ করেছেন। এর পেছনে স্ত্রী প্রতিভা বসু তথা এককালের ঢাকার রানু সোম এবং নজরুলের গানের ছাত্রী ও গুণমুগ্ধার৩৯ পরামর্শ বোধ করি প্রবলভাবে কার্যকরী। নজরুল প্রতিভা সম্পর্কে একই কথা বুদ্ধদেব প্রচার করেছেন তাঁর 'AN ACRE OF GREEN GRASS' প্রবন্ধ সংকলনের NAZRUL ISLAM প্রবন্ধেও।৪০

'অতৃপ্ত কামনা' ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের ৫ম গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে। অতৃপ্ত কামনারও প্রেক্ষাপটে আছে এক বালককালের প্রেমের স্মৃতিসংরাগ। কিছুটা দেবদাসীয় প্যাটার্ন। এ গল্পের নায়িকা মোতি। বি. এ. পাশ ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের ঠিকঠাক হয়ে গেল। ফলে তার প্রেমিক বাধ্য হয়ে মোতিকে তার বিবাহিত জীবনে সুখী করার জন্য বলে 'মোতি তোমায় যে আমি ভালোবাসি না।'৪১

ফলত জনমন্ত্রের ছাড়াছাড়ি। ব্যথা পাওয়া ও ব্যথা দেওয়ার পালা চললো। গল্পের উপসংহারেরও সেই সুর অব্যর্থভাবে বাজিয়ে তুললেন নজরুল :

"আমার হিয়ার চিতায় চিরন্তনী ক্রন্দসীও সাথে সাথে কেঁদে উঠল—'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা।"৪২

'বাদল বরিষণে' ব্যথার দানের তৃতীয় গল্প হিসেবে মুদ্রিত। স্মৃতিধর্মিতা এ গল্পের প্রাণ। 'এক নিমেষের চেনা' ও অভিমানে দেখাশোনা যে অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে, 'বাদলভেজা তারই স্মৃতি' নিয়ে লেখা 'বাদলবরিষণে'। স্মৃতিচারী এখানে এক নায়ক। বাঙালী। উদাসী ছন্নছাড়া সেই প্রাণের ব্যাকুল আর্তি ঘনঘোর শ্রাবণের পটভূমিতে মেদুর ও মনোজ্ঞ। এ গল্পের লক্ষণীয় ব্যাপার রবীন্দ্র উদ্ধৃতির আশ্চর্য চয়ন ও অব্যর্থ ব্যবহার কেবল এই গল্পেই নয়, ব্যথার দানের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই রবীন্দ্রপংক্তি উদ্ধৃত। এই মুহূর্তে হিসেব নেয়া যেতে পারে। ব্যথার দান-৩, হেনা-১, বাদলবরিষণে-৩, ঘুমের ঘোরে-৫, অতৃপ্ত কামনা-২, রাজবন্দীর জবানবন্দী যা গ্রন্থ প্রকাশের সময় রচিত তাতেও ৩টি রবীন্দ্র উদ্ধৃতি ব্যবহৃত।

নজরুলকে কে যেন বলেছেন (মুজফ্ফর আহম্মদ ?) রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাফেজ। কোরাণ মুখস্থ যার তাকে বলা হয় হাফেজ। অজস্র রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ ছিল নজরুলের। গীতাঞ্জলির সব গান নাকি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের পথে ট্রেনের সহযাত্রীকে শুনিয়েছিলেন তিনি। এ সংবাদে বিস্মিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।৪৩ এবং খবর এই যে, সৈন্যবাহিনীতে যাবার সময় নজরুলের সঙ্গী হিসেবে যে সব বস্তু ছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য হোলো রবীন্দ্রনাথের গানের বই।৪৪ নজরুলের পরবর্তী সাহিত্য চর্চায়, বিশেষতঃ গীতি রচনায় তার ওপর রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে গভীর সংক্রাম তার মূলে নিশ্চয়ই এই প্রথম বয়স থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রীতিই বর্তমান। জন্ম রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ এক তরুণ সেনানীর যৌবনস্বপ্নের আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলো মুখর করে তুলেছিলেন পরোক্ষে। একথা তাঁর জানা ছিল না তখনো।

চাকরী থেকে কলকাতায় আসার (১৯২০) ২।৩ দিনের মধ্যে নজরুল ৭।৮ দিনের জন্যে চুরুলিয়ায় যান দেশের বাড়ীতে। এবং সেখানে মায়ের সঙ্গে তাঁর কোনো কারণে মনান্তর ঘটে। নজরুল জন্মের মত ত্যাগ করেন জননী ও জন্মভূমি (গ্রাম)-র সংস্পর্শ।

১৯২০-এ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হল। সূত্রপাত

হল ভারতজোড়া অসহযোগ আন্দোলনের। রবীন্দ্রনাথ বছরখানেকের জন্য বিদেশ (ইউরোপ, আমেরিকা) ভ্রমণে আছেন। নজরুলের চাকরী থেকে আসার ৩ মাসের মধ্যে (১২ই জুলাই ১৯২০) নজরুল ও মুজফফ্‌র আহম্মদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'নবযুগ' পত্রিকা। নজরুল—কথাসাহিত্যিক নজরুল এবার সাংবাদিক ও সম্পাদক হলেন। তাঁর সাংবাদিকতার দক্ষতার কথা সহসম্পাদক স্বীকার করেছেন। 'নবযুগে' লেখা নজরুলের প্রবন্ধগুলোর নির্বাচিত সংকলন ১৯২২ সালের অক্টোবরে 'যুগবাণী' নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল। নভেম্বরের ২৩-এর সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি নং ১৯২ এবং ১৬৬৬১ পি, অনুযায়ী বইটি নিষিদ্ধ হয়।৪৫ এটা পরের কথা। এর আগে নবযুগ পত্রিকাটাই নিষিদ্ধ হল কার্যত। নবযুগের হাজার টাকা জামিন বাজেয়াপ্ত হল। এই সময় নজরুল লিখছেন রীতিমত বেপরোয়া লেখালেখি। ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন ব্যর্থহীন, বীর্যবান বাক্যপ্রয়োগ দুঃসাহসী নজরুলের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯২০ সালে দেশে এখানে ওখানে ধর্মঘট চলছিল। শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্ন নজরুলকে দেখি এই পত্রিকার লেখালেখিতে। নবযুগে লেখা গদ্যের নমুনা হিসেবে তুলে আনা যেতে পারে 'মুয়াজিন্নিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' নিবন্ধাংশের কিছুটা :

"কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর। আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনো সহ্য করিতে পারে কি?...

আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌছিতে পারে না! 'সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। মনে রাখিও সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে। দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে!" (৪৬)

এই গদ্য রচনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের পূর্বোক্ত অভিযোগ অবাস্তর। নজরুলের সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক গদ্যরচনাগুলি এই বিষয় নিয়ে লেখা পদ্যগুলি থেকে অনেক সুন্দর। নজরুলের সমাজ সচেতনতার ও রাজনীতি বিষয়ে লেখা কবিতাগুলির অধিকাংশই শিল্পসার্থকতা লাভ করতে পারেনি। অকুণ্ঠভাবে

একথা স্বীকার করা ভালো। নজরুলের এই ব্যর্থতার পেছনে আছে নিশ্চিতভাবে তাঁর ওপর লেটোর দলের প্রভাব। যে-কোন শব্দে মিল মিলিয়ে শ্রোতা/পাঠককে চমক দিয়ে স্বভাবকবির দক্ষতা দেখাবার মনোভাব। তাছাড়া অতি-মাত্রায় বিষয়নির্ভরতা ঐসব কবিতায় অঙ্গসজ্জার চাইতে বক্তব্য প্রকাশের দিকে বেশী কবিকে ব্যাপৃত রেখেছে। মোটকথা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম নির্বাচনে নজরুল ভুল করেছেন। যে সব বিষয় মূলত সমাজচিন্তা ও সমস্যা-মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ আঙ্গিকে লেখা উচিত ছিল সেগুলিকে তিনি পদ্যে রচনা করেছেন। ফলে পদ্যগুলি কবিতা হয়নি সামগ্রিকভাবে। বড় বড় কবিতার অন্তর্গত ২-৪ পংক্তি আশ্চর্য কাব্যগুণসমৃদ্ধ চমক সৃষ্টি করলেও আগাগোড়া রচনাটি কাব্যিক হয়ে উঠতে পারেনি।

'নবযুগের' দায়িত্বে থাকাকালে নজরুলের আবাস ৮/এ টার্নার স্ট্রীট। বর্তমান নওয়াব আবদুর রহমান স্ট্রীট। সঙ্গী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ উল্লেখ করেছেন এই সময় এইখানেই নজরুল তাঁর বহুবিখ্যাত কবিতা লিখেছেন।[৪৭] নিশ্চয়ই সে কবিতাগুলির মধ্যে মোসলেম ভারতে প্রকাশিত সেইসব কবিতা-গুলি আছে যেগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার (ভাদ্র ১৩২৭, মোসলেম ভারত দ্রঃ)। মোহিতলালের প্রশংসিত কবিতা দুটির মধ্যে আছে 'খেয়া পারের তরণী' ও 'বাদলপ্রাতের সরাব'। এছাড়া ঐসময়ে মোসলেম ভারতে ছাপা হয়েছে মোহররম, কোরবাণী, সাত-ইল-আরব, ফাতেমা-ই-দোয়াজ-দহম, প্রভৃতি। [এছাড়া বাদল বরিষণে, গল্প, 'বোধন' (কবিতা), তিনটি গান, হাফিজের গজল, বিরহবিধুরা (কবিতা), 'মরমী' (গান)—এ সব তথ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবেরই দেয়া]

অধিকাংশ কবিতাতেই ইসলামিক সংস্কৃতি ও আরবজীবন প্রতিবেশ অসাধারণ কাব্যরূপ পেয়েছে। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার নাম মাহাত্ম্যেই বুঝি নজরুলের লেখনী থেকে ইসলামিক ঐতিহ্য সম্পর্কে এত সুতীব্র আবেগ-ময় কবিতা নির্গলিত হয়েছে। অবশ্য ইসলামিক ঐতিহ্য-প্রীতি আগাগোড়া নজরুলের মধ্যে ছিল। এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। বা মোসলেম ভারত ছাড়া নজরুল ইসলামিক ঐতিহ্য নিয়ে লিখতেন না এমন কথাও আমরা বলতে চাই না। শুধু এটুকু ভাবতে হচ্ছে যে মোসলেম ভারত এই সময় নজরুলের এই চিন্তাকে কার্যে স্ফুরিত করতে সহায়ক হয়েছিল।

যাই হোক, নবযুগ পত্রিকা ছাড়লেন নজরুল ১৯২০-র ডিসেম্বরে। কিছু

বন্ধুদের কথায়। দেওঘরে বেড়াতে গেলেন তিনি। দেওঘরে যাবার সময় তাঁর একটি কবিতা (গানও বটে)-র উল্লেখ করেছেন মুজফফ্‌র আহম্মদ। কবিতাটি (দূরের বন্ধু) ডিসেম্বরে লেখা এবং বিলম্বে প্রকাশিত (জানুয়ারী ১৯২১) কার্তিক সংখ্যা মোসলেম ভারতে প্রকাশিত। ছায়ানট (১৯২৫) কাব্যের অন্তর্গত উল্লেখে ডি. এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত 'সঞ্চিতা'য় কবিতাটি এখন প্রাপ্তব্য।

কবিতাটির তিনটি স্তবক। এক দূরের বন্ধুর উদ্দেশ্যে ছন্নছাড়া উদাসী পথিক মনের কথা এ কবিতা। আপাতভাবে এই রূপই মনে হয়। কিন্তু কবিতাটি মূলতঃ হাফিজ, খৈয়াম বা গালিবের আত্মসম্বোধী মেজাজে লিখিত। কবিকে থেকে থেকে যে বন্ধু সুদূরের নির্জনপুরে ডাক দিয়ে যায় সে বাহ্যত হয়ত এক কালের কোনো প্রিয় / প্রিয়া। আসলে কিন্তু সে কবিরই অন্তর্গত এক ঘরছাড়া সত্তা। যার সৃষ্টিমূলে আছে প্রেমজীবনের ব্যর্থতার বেদনা। সে সত্তা শিথিল করে দেয় সব বাঁধন। পথের ধারে বাসা বাঁধতে তার চোখে কান্না আসে। তার সুরে সুরে উত্তরের বাতাস এবং ভেজা ঘাসে জাগে যথাক্রমে দীর্ঘশ্বাস ও শিশিরবিন্দুপম অশ্রু। কবিতাটি যে ডিসেম্বরের শীতে লেখা (মুজফফ্‌র আহম্মদের দাবীও তাই) তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এইখানে।

দেওঘরে একমাসের মত ছিলেন নজরুল। ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারীতে ফিরলেন কলকাতায়। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। কয়েকদিন নতুন করে আবুল কাশেমের পরিচালনায় প্রকাশিত 'নবযুগে' লিখলেনও। তারপর চৈত্র মাসে (মার্চ/এপ্রিল ?) কুমিল্লা গেলেন। সেখানে ঘটলো সেই করুণতম ঘটনা। সইদা খান—নজরুলের দেয়া নাম নার্গিস আসার খানম এর সঙ্গে পরিচয়, বিবাহের ব্যবস্থাপনা ও চিরবিচ্ছেদ। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ওখানে ছিলেন নজরুল। জুলাই এর প্রথম সপ্তাহের শেষে (৮ই জুলাই) ফেরেন কলকাতায়। এসব খবর মুজফফ্‌র আহম্মদ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন তথ্যনিষ্ঠভাবে। এই আঘাতের পর থেকে নজরুল আবার কবিতা রচনায় মুখর। এই রচনাবলী সম্বন্ধে মুজফফ্‌র আহম্মদ বলেন ঐ সব কবিতা—"কিন্তু হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়,—নূতন জীবনের গান, শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর গান।"৪৮

নার্গিস আসার খান-এর বাড়ী থেকে বিয়ের রাতে চলে এসে নজরুল আশ্রয় নিয়েছিলেন কুমিল্লায় সেনগুপ্ত পরিবারে। তখন অসহযোগ আন্দোলনের জন্য

সারা ভারত জুড়ে যে জনজাগরণ, মিছিল, মিটিং চলছিল কুমিল্লায়ও তার ঢেউ লাগলো এসে। নজরুল সদ্য-পাওয়া আঘাত বুকে পোষণ করে যুক্ত হলেন সেই গণ-আন্দোলনে। অসহযোগের প্রবক্তা গান্ধীজীকে স্মরণে রেখেই লিখলেন সেই বিখ্যাত গান—"এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙিনায়!" রচনা নয় শুধু গানটি তিনি কুমিল্লায় মিছিল-মিটিং-এ গেয়েও শোনালেন। লোক পরিচিতও ঘটলো যথেষ্ট। 'বন্দী-বন্দনা' গানটিও ঐ সময় রচিত ও গীত হয়। যার প্রথম পংক্তি—"আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে," গানটির গীতি উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা কতখানি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আজ বলা শক্ত। তবে রচনাটির কাব্যগুণ, তার শব্দ ঝংকার, চিত্রকল্প যথেষ্ট উচ্চমানের একথা অনস্বীকার্য, বিশেষ করে যেখানে কবির চিন্তা: পরাধীন জাতির ক্ষেত্রে সমগ্র নিখিল বন্দীশালা। অতএব কারাগারকে বীরদল ভয় করে না—বক্তব্যটি অসাধারণ। কুমিল্লায় গীত এই গান কি বুদ্ধদেব বসুকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল? তাঁর 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থের নামকরণে এই রচনাটির প্রভাবের কথা ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশ করেছেন।৪৯ তবে মনে রাখা দরকার নজরুলের স্বদেশ চিন্তা ও পরাধীনতার শৃংখল ছেদনের ভাবনা বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র ভাবনার বিষয় নয়। নজরুলের এই রচনাটি একান্তভাবেই স্বদেশের বন্ধন ছেদনের সংগীত। দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার পাশে পাশে নজরুল ঐ সময় কিছু রোমান্টিক গীতিকবিতাও রচনা করেছিলেন। নিশ্চয়ই সেই কবিতাবলীর পটভূমিকা রচনা করেছিল নার্গিস আসার খানের দেয়া বেদনা আর প্রমীলাদের বাড়ীর জীবন্ত আনন্দ। প্রমীলার সঙ্গে কি তখন নজরুলের নতুন জানাশোনা শুরু হয়েছে? স্পষ্ট না হলেও কবিতাগুলি অন্ততঃ সদর্থক জবাবেরই পক্ষে। 'দোলন চাঁপা' কাব্যের অন্তর্গত 'দুপুর অভিসার' কবিতাটি মুজফ্‌ফর আহম্মদ সাহেব উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটির ছন্দ এবং মিলের প্রশংসা কবি কালিদাস রায়ও করেছিলেন—এসবও মুজফ্‌ফর সাহেবের শোনা কথা।৫০ বস্তুতঃ 'দুপুর অভিসার'-এ যে বালিকা মহিলার 'কলস কাঁখে' ছবি এঁকেছেন কবি তার রূপ ও বয়স তখনকার প্রমীলারই বয়সের সমান বলে অনুমান হয়। এই সময়ে লেখা নজরুলের কবিতাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া মুস্কিল। তবে মুজফ্‌ফর আহম্মদ সাহেব আরো কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। আমরা কবিতাগুলির নাম ও প্রথম পংক্তি উল্লেখ করে রাখতে চাই।

(i) রেশমী ডোর/প্রথম পংক্তি: তোরা কোথা হতে কেমনে এসে মনি-মালার মতো আমার কণ্ঠে জড়ালি

(i) পুলক/সর্ষে ফুলে লুটলো কার হলুদ রাঙা উত্তরী

(i) অভিমানিনী/ওরে অভিমানিনী, এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি

(i) স্নেহাতুর/এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী

শেষ দুটি কবিতার প্রথমটি সম্পর্কে তথ্য এই যে, বিরজা সুন্দরীর এক কন্যা মরবার কিছুক্ষণ আগে তার মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল অভিমান করে ; তার পরেই তার মৃত্যু ঘটে। এ বেদনার কথা শুনে নজরুলের এই কবিতা। শেষেরটি নজরুলকে বলা বিরাজা সুন্দরীরই উক্তি। ছন্দরূপ কেবল নজরুলের।

নভেম্বরে ঐ বছরে পুনরায় কুমিল্লা যান নজরুল। এই সময় ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতে এলে কংগ্রেস দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। কুমিল্লাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। নজরুল সেই প্রতিবাদ মিছিলের জন্য গান লিখেছিলেন। নিজেও মিছিলের পুরোভাগে থেকে সেই গান গেয়েছেন। গানটির দুটো স্তবক ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তার প্রথম পংক্তি—'জননী আমার ফিরিয়া চাও।'[৫১]

১৯২১-এ লেখা আরও কয়েকটি কবিতার খবর আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কামালপাশা'। কবিতাটি কুমিল্লার দুর্ঘটনার আগে না পরে লেখা নিশ্চিতভাবে এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে ১৩২৮ কার্তিক সংখ্যায় মোসলেম ভারতে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর কার্তিক সংখ্যায় 'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি ছাপতে দেওয়া হয়েছিল যখন তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১-এর দিকে বা একটু আগে কবিতাটি লেখা এবং নার্গিস খানের সঙ্গে সে ঘটনা চৈত্রে (মার্চ)-ই ঘটে গেছে।

যাই হোক কবিতাটির বক্তব্যের তিনটি দিক আছে।

i) ঐতিহাসিক পটভূমি।

ii) স্বদেশ চেতনা তথা দেশ মাতৃকার প্রতি অকুণ্ঠ, জীবনপণ ভালোবাসা

iii) এক অপূর্ণ বাসনাময় প্রেমিক হৃদয়ের গুমরানো বেদনা।

কবিতাটির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে মুজফ্ফর আহম্মদ সাহেব তাঁর নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য দুটি তথ্য আমরা পুনরায় স্মরণ করছি : (i) কবিতাটিতে অনৈতিহাসিকভাবে আনোয়ার পাশার সঙ্গে কামাল পাশার সহাবস্থান চিত্রিত করা হয়েছে।

i) গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে কামাল পাশার জয়লাভের আগেই কামাল পাশার বিজয়োল্লাসের কল্প দৃশ্য অঙ্কন করেছেন কবি।[৫২] এটা বিস্ময়জনক। কবির মনোভূমি যে 'রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য'।[৫৩] বাংলা সাহিত্যে কামালপাশা কবিতাটি তা ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ প্রতিপন্ন করে দিয়েছে।

'কামালপাশা' কবিতাটির গঠন সম্বন্ধে একটু কথা বলা প্রয়োজন। আসলে 'কামালপাশা' কি কবিতা? আর যাই হোক নিটোল গীতি-কবিতা বলতে যা বুঝি কামাল পাশা তা নয়। অন্তত 'বিদ্রোহী' কিংবা 'ঝড়ের' মত কিংবা 'ফতেয়া-দোহাজ-দহম'-এর মত দীর্ঘ আবেগ-ঘন কবিতাও না। 'কামালপাশা' ঐতিহাসিক নাট্য-কাব্যধর্মী রচনা। যদিও এখানে নাট্যকাব্যের মত চরিত্রের মুখে বিন্যস্ত নাট্য-সংলাপ নেই। তবু এটুকু স্পষ্ট যে এখানে একটি ছোট্ট বাহিনী (তথা কয়েকটি সৈনিক চরিত্র আছে, নামহীন অথচ বলিষ্ঠ, জীবন্ত, ভাষাময় এবং নাটকের পরিভাষায় Action-মুখর)-র মুখে কবিতাটি বসানো হয়েছে। বিজয়ী সেই সৈন্যবাহিনীর মার্চের তালে, যুদ্ধের টুকরো স্মৃতিচারণায়, মৃত সব সঙ্গীদের বহনের দরদে, বিজয়ী কামালকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উত্তেজনায় এক অসাধারণ নাট্যরূপ লাভ করেছে কবিতাটি। সবোপরি আছে নাট্য-ভাষ্যের মতো কবির অনবদ্য গদ্য-কাব্য। বিদ্রোহী নয়, কামাল পাশা এই একটি কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল নিজের প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের জগতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার এইখানে যে কবিতাটির আশ্চর্য গঠনশৈলীর সঙ্গে তৎকালীন বাংলা কাব্য-বোদ্ধাদের প্রাণের যোগ ছিল না। কবিতাটি উপলব্ধির জন্য দুটি ব্যাপার জরুরী (১) সৈনিক জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচয় ও (২)—আর্বী-ফারসী শব্দের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। তাছাড়া এই মুহূর্তে আরও একটা কথা ভাবতে হচ্ছে। মোসলেম ভারতে ছাপানোর জন্য কামালপাশা কবিতাটি কি তৎকালের বেশীসংখ্যক লোকের কৌতূহল অর্জন করেনি? কে জানে সাপ্তাহিক কাগজ 'বিজলী'-তে প্রথম না ছাপলে বিদ্রোহীরও ঐরূপ দশা ঘটতো কিনা?—এ-জাতীয় ভাবনা অবশ্য মুজফ্ফর আহম্মদ সাহেবেও দেখেছি। কামাল পাশা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অপরিচয়ের ও নিস্পৃহতার ভাব নজরুলের কবিতা রচনাকালে হয়তো ছিল। কিন্তু খবর হিসাবে একথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯৩৮-এর ১৮ই নভেম্বর কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কামাল আতাতুর্কের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যময় ও

মূল্যবান মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ হলেও সে তাঁর অংশের কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধার করে দিলাম :

"শতাব্দীর অধিক কাল হল আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জগতের শাসন-শৃংখলে বাঁধা আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ *শতাব্দীতে আমরা উপবাসী, আমরা রোগজীর্ণ, দারিদ্র্যে আমরা সর্বতোভাবে পঙ্গু। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে তার স্পর্শ* আমরা পাইনি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে।......

এশিয়ার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দেখলুম তুর্কী যাকে Sickman of Europe বলে অবজ্ঞা করতো, সে কিরকম প্রবল শক্তিতেই অসম্মানের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলল। য়ুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে সে আপন জয়ধ্বজা তুলে ধরলে। এশিয়ার ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত ইতিহাসের আওতার আলোচ্ছায়ার ভিতর একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করল। মনে হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত নয়—যা চাই তা পাব। মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে।"

কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে কবি বললেন, "তিনি তুর্কীকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়। তিনি তুর্কীকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের আবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। যে অন্ধতা ধর্মেরই বড় শত্রু, তাকে পরাভূত করে তিনি কি করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবি। তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সে বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্লভ—বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সবচাইতে বড় মহত্ত্ব, বড়ো দৃষ্টান্ত।...তুর্কীকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক।[৫৫]

নজরুল তাঁর ২২ বছর বয়সে লেখা কবিতায় কামালের স্বাধীনচেতা, স্বাধীনতাপ্রিয় বীর চরিত্রের বন্দনা করেছিলেন নিতান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে। বলাবাহুল্য কামালের তখন (১৯২১) জয়ও সম্পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে এই ঘটনার ১৭ বছর পরে তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সমগ্র জীবন ও কার্যের মূল্যবান সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দু'জনের বক্তব্যের পার্থক্য থাকবেই। এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে সচেতন রবীন্দ্রমননে কামাল আতাতুর্ক যে মর্যাদা

পাবেন এটাও স্বাভাবিক। অন্ততঃ সেই সময় যখন পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত।

যাই হোক্ 'কামাল পাশা' কেবল নজরুলের নয়, বাংলা কাব্য সাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। কবিতাটির শ্রুতিগ্রাহ্য আবৃত্তি কোনো কোনো অনুষ্ঠানে শুনেছি। মনে হয় দৃশ্যকাব্যধর্মী এই কবিতাটিকে সুনিয়ন্ত্রিত শব্দ ও আলোক ক্ষেপনের সাহায্যে মঞ্চস্থ করলে নজরুলকে নতুন আর এক রূপে উপলব্ধি করবেন দর্শকেরা।

আনোয়ার পাশাকে নিয়েও নজরুলের একটি কবিতা আছে। এবং তা কামাল পাশারও আগে লেখা। তবে তার শিল্প সৌকর্য কামাল পাশা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি, উৎকৃষ্ট নয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও স্বদেশানুরাগ কাবতাটির সার্বিক ত্রুটিকে অস্বীকার করে উজ্জ্বল।

১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল লিখলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা।৫৬ কবিতাটি নজরুলকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিল আর যুক্ত করে দিল তাঁর নামের পূর্বে 'বিদ্রোহী' অভিধা।

তথ্যপঞ্জী

১। আজীজ আল আমান/নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড/হরফ,

২। শ্রী মধুসূদন বসু/নজরুল কাব্য পরিচয় / ২য় সংস্করণ,

৩। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়/কাজী নজরুল/এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড,

৪। "ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাষ্টারের বড় আশা ছিল— আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এ সময় এলো ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টনে।"

৫। মুজফ্ফর আহম্মদ/নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা/ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী

প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৩ সং/পৃঃ ৪৩। এরপর থেকে গ্রন্থটি স্মৃতি কথা বলে উল্লিখিত হবে।)

৬। কেশব চৌধুরী/ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৪৩/পৃঃ ১৯১-২০১।

৭। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়/আমার বন্ধু নজরুল/লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৬/পৃঃ ১৩৯।

৮। মুজফ্‌ফ্‌র আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৬।

৯। কথকতা/চোরাবালি পাঠ্য। যার অংশ বিশেষ :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসি
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ।

১০। বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী/নজরুল রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড/হরফ, মে ১৯৮০/পৃঃ ২৫৩।

১১। মুজফ্‌ফর আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৫-৩৩।

১২। আজীজ আল আমান/নজরুল পরিক্রমা ২য় খণ্ড/হরফ ১৩৩৬/পৃঃ ৬।

১৩। তদেব।

১৪। কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬।

১৫। মধুসূদন বসু/নজরুল কাব্য পরিচয়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৫।

১৬। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৮-২০।

১৭। নজরুল রচনা-সম্ভার, ২য় খণ্ড/হরফ, মে, ১৯৬০/পৃঃ ৩৮৭।

১৮। তদেব/পৃঃ ৩৮৮।

১৯। তদেব/পৃঃ ৩৯৬।

২০। নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড/হরফ, পূর্বোক্ত/কবি জীবনী অংশ/পৃঃ ৪৮।

২১। মধুসূদন বসু/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৫।

২২। নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড/হরফ ১৬৮১ সং/পৃঃ ৪০৪-৪০৫।

২৩। মধুসূদন বসু/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৫।

২৪। মুজফ্‌ফ্‌র আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৪৬-৪৭।

২৫। মুজফ্‌ফ্‌র আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৮১-২৮২।

২৬। নজরুলের সৈনিক জীবনের সঙ্গী বন্ধু শম্ভু রায় তথ্য দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তাছাড়া মাসিক পত্রিকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজ পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী রাখতো।" প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড ১৯২১ / পরিশিষ্ট / পৃঃ ২৮৯।

২৭। নজরুল রচনা সম্ভার ২য় / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৭৮।

২৮। গোপন প্রিয়া / সিন্ধু হিন্দোল / সঞ্চিতা / ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৭৯ পৃঃ ১৩৮।

২৯। নিশীথ্-প্রীতম / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৪।

৩০। গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী / দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা-কথাসাহিত্য / অভী প্রকাশন ১৩২০ / পৃঃ ২৬৯।

৩১। মুজফফ্‌র আহম্মদ / স্মৃতিকথা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৪।

৩২। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / আমার বন্ধু নজরুল / লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৮ / পৃঃ ২২৬-২২৭।

৩৩। শ্রী মধুসূদন বসু / নজরুল কাব্য পরিচয় / পূর্বোক্ত সং / পৃঃ ৪-৫।

৩৪। শম্ভু রায়ের পত্রাবলী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে / কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৯৬।

৩৫। নজরুল রচনা সম্ভার ২য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত সং. / পৃঃ ৩৪৫।

৩৬। " " " " / " " / পৃঃ ৩৪৪।

৩৭। আজীজ আল আমান / নজরুল রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত / পুস্তক পরিচিতি অংশ / পৃঃ ৬৭৮।

৩৮। বুদ্ধদেব বসু / কালের পুতুল / নিউ এজ ১৯৫৯ / পৃঃ ১২৯।

৩৯। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / কাজী নজরুল / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১১৩।

৪০। AN ACE OF GREEN GRASS / BUDDHADEVA BOSE Papyrus 1952 / pp.-48-54.

৪১। নজরুল রচনাসম্ভার, ২য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ-৩২৬।

৪২। " " " / " " / পৃঃ-৩২৭।

৪৩। শিশিকান্ত রায় চৌধুরী / আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল / কথা সাহিত্য, নজরুল সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৩৩৭ / পৃঃ ১১৬১-৬৩।

৪৪। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৯।

৪৫। শিশির কর / নিষিদ্ধ নজরুল / আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৩ / পৃঃ ১০।

৪৬। মুজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / হরফ-১৯৩১ / পৃঃ ২৮৮।

৪৭। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৯২।

৪৮। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ / " " / পৃঃ ১৬০।

৪৯। ডঃ সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড / ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৩১ / পৃঃ ৩০৪।

৫০। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৬৯।

৫১। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / নজরুল চরিত মানস / ভারতী লাইব্রেরী পৃঃ ২২৯।

৫২। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৯৩-৯৫।

৫৩। রবীন্দ্রনাথ / ভাষা ও ছন্দ/কাহিনী / বিশ্বভারতী

৫৪। মুজফফর আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৪১।

৫৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় / রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড / বিশ্বভারতী / পৃঃ ১৬১-১৬২ থেকে উদ্ধৃত।

৫৬। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৩৫।

বিশ্বাস্য না হলেও একথা সত্য যে, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী নয়, মূলত রোম্যান্টিক। নজরুলের কাব্যে রোম্যান্টিকতার স্বরূপ আমাদের আলোচনার অন্য এক অধ্যায়। বর্তমানে 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলামের জীবন-মূলে কোন্ বিশিষ্ট দার্শনিকতা নিহিত তার অনুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তি জীবনের প্রেম-প্রহত নজরুল ব্যষ্টির নয় সমষ্টির প্রেমে নিজেকে মগ্ন করতে চেয়েছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে দেশপ্রেম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিবারণ চন্দ্র ঘটকের প্রভাব তাঁর বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল হয়তো। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, ও সৈন্যবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুজফফর আহম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে নজরুলের সমাজসচেতন মানসিকতার সুস্পষ্ট উদ্বোধন ঘটে। ছোটবেলা থেকে যে দারিদ্র্য ও অপমানের মধ্যে তিনি বড় হচ্ছিলেন, তাও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ চিত্তকে তপ্ত করেছিল। সমাজজীবনের অন্ধ সংস্কার, বিশ্বাস, জাতপাতের সমস্যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পীড়িত করেছিল।২ সমকালের রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। সেই সমস্যার মূল পরাধীনতার গ্লানি ও অত্যাচারের মধ্যে নিহিত।

ইংরেজ সরকারের শাসন-পীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার চিন্তা এক দিকে যেমন নজরুলকে বিচলিত করেছিল অন্যদিকে তেমনি বিজিত জাতির দুর্বলতা, আত্ম-সম্মানজ্ঞান-হীনতা, ভীরুতা, দাসমনোবৃত্তি তাঁকে পীড়িত করেছিল সর্বাধিক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণে হীন-বীর্য এক জাতিকে উজ্জীবনের মন্ত্র শোনাতে চাইলেন কবি। সে মন্ত্র বিদ্রোহের।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার মূলে ছিল মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। আর এই মানবতার অসম্মান তিনি যখন যেখানে দেখেছেন, বিদ্রোহে মুখর হয়েছেন। নজরুলের বিদ্রোহের তাৎপর্য গভীর, ব্যাপক ; জীবন ও জগতের বহু সূত্রে তার সন্ধান ও বিচার চলবে। মানবসমাজের অবিচার, অসাম্য থেকে শুরু করে জগৎ পিতার নিরঙ্কুশ শাসনাধীপত্য পর্যন্ত তাঁর বিদ্রোহের অধিকাংশ সীমা বিস্তৃত।৩ রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা যেন তারে তৃনসম দহে"।৪ তাই নজরুল প্রথমেই অত্যাচারিত,

নিপীড়িত জনমানসকে শোনালেন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার মন্ত্র। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে আণবিক শক্তি, অফুরন্ত প্রাণের উল্লাস, আনন্দ। বিদ্রোহী কবিতায় রূপায়িত হল সেই ভাবনা। ১৯২১-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লিখলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। কবিতাটি ছাপা হল সাপ্তাহিক বিজলী ও বিলম্বে প্রকাশিত হল মোসলেম ভারতের কার্তিক সংখ্যায়।

কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যের। অগ্নিবীণায় নামকরণে হয়তো রবীন্দ্রনাথ আছেন। আছে রবীন্দ্রনাথের গান। গীতালির ৫৫ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে।' শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় যে যৌবন, গতিবেগ ও শক্তি বন্দিত হয়েছে বলাকা (১৯১৬)-র ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৪, ২৯ এবং ৪৪ সংখ্যক কবিতার বক্তব্যের সাথে তার সাযুজ্য আবিষ্কার করা যায়।৫

১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' ২য় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ। নজরুলও এই সভায় বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি ওদুদ সাহেবের 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা (যা 'প্রবাসী'-তে 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' শিরোনামে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। 'মানসী'-র 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতার সঙ্গে বিদ্রোহীর তুলনা করতে গিয়ে 'বিদ্রোহী'র বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন।)-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বিদ্রোহী কবিতা সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেন : "বিদ্রোহী কবিতাটি আমার গভীর অনুভূতিলব্ধ জিনিষ। তীব্র বেদনাবোধ থেকে এর উৎপত্তি। যেদিন কবিতাটি লিখি প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি।"৬

এইসব তথ্যাবলীর পাশে আর একটি ভাবনাও যোগ করা দরকার।' বিদ্রোহী' কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে রবীনাথের 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ভাব অনুষঙ্গ ক্রিয়াশীল। 'চিত্রার' বহুখ্যাত কবিতাটিতে যে ভাবনা-গুলি আছে তার মধ্যে (১) বিশ্বজুড়ে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ, (২) নতশির মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কবির অন্তরাত্মার সচেতনতা। (৩) নতশির মানুষকে উন্নত ও প্রতিবাদী হবার জন্য পরামর্শ দান। (৪) সবশেষে মহৎ জীবনের যাত্রান্তে আপন ও বিশ্বজগতের দেবতার কাছে নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণ। নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনে এইসব কটি বৈশিষ্ট্যই আছে। বিদ্রোহী কবিতাটিতে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ৩য় বৈশিষ্ট্য প্রায় আক্ষরিকভাবে ধ্বনিত।

আমরা পাশাপাশি দুটো কবিতার অংশ উদ্ধৃত করতে চাই। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের—

"ডাকিয়া বলিতে হবে—

মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।"৭ -এরসঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি স্মরণীয়:

"বল বীর—

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।৮

ভীরু, দুর্বল, নিপীড়িত মানুষকে 'উন্নত শির হবার কথা ডাকিয়া বলার' দায়িত্ব কি নজরুল নেননি বিদ্রোহী কবিতায়?

কেউ কেউ মনে করেন বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল নিজের কবিসত্তার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।৯ আসলে তা যে নয় তা নজরুলের বিদ্রোহ-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলে বোঝা যাবে। কেবল বিদ্রোহী নয়, তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলিতে নজরুল যুক্ত করতে চেয়েছেন এক বিশিষ্ট দার্শনিকতা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। নজরুল বোঝাতে চেয়েছিলেন, এক অর্থে প্রত্যেকটি মানুষই সেই পরম শক্তিমানের সৃষ্টি। মানুষের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের প্রকাশ। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির পারস্পরিক এই সম্পর্ক বুঝে নিতে তাকে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে ইসলামের সুফী সাধনা, রবীন্দ্রনাথের প্রেম দর্শন—যেখানে জগৎ, ঈশ্বর ও মানবিক প্রেম একাকার। এবং নিশ্চিতভাবে সমকালীন উর্দু সাহিত্যের কবি ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন। ইকবালের 'আসরারে খুদি'র ভাবনার সঙ্গে বিদ্রোহী কবিতার ভাব-সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় কেবল নিজের নয়, সকল মানুষের সত্তার কথা বলতে চেয়েছেন। মানুষকে সবচেয়ে শক্তিমান মনে করেন কবি। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও এই মানুষের বন্দনা করেন তিনি—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।১০ তাঁর মতে স্রষ্টাকে সৃষ্টি বারবার শঙ্কিত ও শিহরিত রেখেছে তার দুরীয় শক্তিতে। বন্যা, ভূমিককম্প, মহামারী যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ —সৃষ্টিরই রূপ। সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকেই স্রষ্টা ভীত ও ত্রস্ত। 'অভিশাপ' কবিতায় এই বিশিষ্ট দার্শনিকতা স্পষ্ট করেছেন তিনি। কবি দেখিয়েছেন আদি-অন্তহীন সেই দিনে, পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিক্ষণে যে বিপুল তাণ্ডব ও দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছিল, সেটা আসলে আর কিছু ছিল না—ছিল স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির

প্রথম বিদ্রোহ। স্রষ্টার অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টি সেই আদিম লগ্ন থেকেই। অগ্ন্যুদ্গার উল্লাসে আর নিদাঘ দগ্ধ বিনা মেঘের ঐ তপ্ত বজ্রে সৃষ্টির অট্টহাসি বেজে চলেছে আজও। প্রকৃতির যাবতীয় দুর্যোগের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে সৃষ্টির ঐ করাল মূর্তি। নজরুলের সমস্ত বিদ্রোহাত্মক কবিতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা একটা বড় জায়গা কেন জুড়ে আছে এইসূত্রে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। যুগে যুগে মহাবিপ্লবের জন্ম ধূমকেতুর আবির্ভাবের কথা নজরুলকে বলতে হয় তাই। লিখতে হয় 'ঝড়' কবিতা।

'অভিশাপ', 'বিদ্রোহী,' 'ঝড়', 'ধূমকেতু'—প্রত্যেকটি বিদ্রোহাত্মক কবিতায় বর্ণিত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রসঙ্গ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা আছে নিম্নোক্ত অংশগুলিতে :

* মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।

* আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর।

* আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণী।

* আমি মহামারী

* আমি বজ্র

* আমি দাবানল দাহ

* আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল

* আমি বসুধা বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি বাড়ব বহ্নি কালানল,

* আমি ধূমকেতুজ্বালা, বিষধর কালফনী

'ঝড়' কবিতায়ও আছে প্রলয়, তুফান, বন্যা, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্বনাশ-এর কথা।

আমরা পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। নজরুলের 'বিদ্রোহ' দর্শনে 'সৃষ্টি' যে অসীম শক্তিমান—একথা প্রচার করবার দরকার ছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম বাক্যের গঠনের দিকে তাকালেই উপলব্ধি হবে একথা যে, 'আমি' মানে কবি নজরুল একা নন। 'আমি' মানে এখানে প্রত্যেকটি পদদলিত মানুষ, লাঞ্ছিত মানুষ, যাদের 'উন্নত শির' হবার পরামর্শ দিয়েছেন কবি। 'সর্বজয়ী মানুষের অভ্রভেদী মহিমা'[১১] প্রচারের উদ্দেশ্যে কবি বলে ওঠেন :

'বল বীর

বল চির উন্নত মম শির'। যদি 'মম' মানে নজরুলের নিজের হোতো তবে নিশ্চয়ই 'বল' এই অনুজ্ঞাবাচক শব্দ উচ্চারণের দরকার হোত না।

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে অসীম শক্তি আছে তারা যদি সম্মিলিত হয়, যদি রুখে দাঁড়ায়, তবে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ কেঁপে উঠে নিভে যাবে। অতএব এদের ওপর যারা অত্যাচার করে (অত্যাচারী শাসক ইংরেজ?) তাদের সাবধান হবার দরকার আছে। 'ঝড়ের মুখে খড়ের মতন' এই অত্যাচারী শক্তি উড়ে যাবে যদি রুখে দাঁড়ায় এই আণবিক শক্তিসম্পন্ন প্রত্যেকটি 'আমি'।

সমস্ত অন্যায়, অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিমান 'আমি'র ভয়াল রূপকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন কবি। মূলত এক ভয় জাগানিয়া মানসিকতা বিদ্রোহাত্মক কবিতায় ভয়াল সব চিত্রকল্প প্রয়োগের মূলে আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এটুকুই সব নয়, যে বিদ্রোহী 'ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন' বলে সেকি তাহলে ঈশ্বর-দ্রোহী? বিবেচনা করে দেখতে হবে এ জাতীয় বক্তব্যের তাৎপর্য। 'অভিশাপ' কবিতায়ও এ জাতীয় ঈশ্বরদ্রোহিতার প্রকাশ আছে। আপাতদৃষ্টিতে একে ঈশ্বরদ্রোহিতার প্রকাশ বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা স্রস্টা এবং সৃষ্টিতত্ত্বের যে কথা আগে বলেছি সেই আলোকে ব্যাপারটিকে দেখলে বলা যেতে পারে এই ঈশ্বরদ্রোহিতা আত্মদ্রোহিতারই প্রকারভেদ মাত্র। স্রষ্টাকে সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি তুরীয় শক্তিতে ভগবান তথা স্রষ্টাকেও 'পিষে মারে পলে পলে' (অভিশাপ কবিতা)। কখনো বা সে 'ভগবান বুকে পদচিহ্ন' এঁকে দিতে পারে। যে স্রষ্টা খেয়ালী এবং শোকতাপ দেন তাকে আঘাত করার অধিকার সৃষ্টিরই আছে। কেন না সৃষ্টি 'আমি'ই স্রষ্টার অংশ। 'জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য।'

সুফী মনসুর 'আন আল হক' তথা 'আমিই সে' উচ্চারণ করে উন্মাদ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। এবং এর পরিণতি হয়েছিল ভয়ানক। ভাববাদী মনসুরকে গোঁড়া মুসলমানরা হত্যা করেছিলেন। এই মুহূর্তে কবি মনে সেই জাতীয় অনুভূতি ক্রিয়াশীল হতে পারে।[২]

এছাড়া বিদ্রোহী কবিতার 'ভগবান বুকে পদচিহ্ন' আঁকার অন্য তাৎপর্যও ভাবতে হয়। মনে হয় এ ব্যাপারে বিষ্ণুর বুকে কৌস্তভ মণির মতো, সৃষ্টি তার পদচিহ্ন লাঞ্ছনা রেখে দিতে চায়—এমন ভাবনাও কবির মনে থাকতে পারে।

প্রিয়তমের কঠিন পদাঘাতের চিহ্ন বক্ষে ধারণ, প্রিয়ার দেয়া আঘাত বক্ষে ধারণ করার গৌরব—বিষ্ণুরই আছে। 'ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন' লেখার সময় কবি যে এইরূপ Myth স্মরণে রাখেননি তা বলা শক্ত। কেননা দোলন চাঁপার অন্তর্গত 'ব্যথা-গরব' কবিতায় প্রেম প্রসঙ্গের কবিতায় লিখেছেন নজরুল :

সেই পদচিহ্ন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে
ছাই ভৃগুপদ যাও হে দেখে
কি কৌস্তুভ এ হিয়ায় রাজে।১৩

এই সূত্রে কেউ কেউ 'বিদ্রোহী' কবিতাকে আধ্যাত্মিক কবিতা বলবার সুযোগ পেয়েছেন।১৪ কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে বিশিষ্ট দার্শনিকতা এই কবিতার মূলে আছে তাকে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক হবার দরকার নেই। অন্তত ব্যক্তি নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা কবিতাটিতে অনুসন্ধান করা বৃথা। এখানে সহসা আত্মসম্বিৎময় 'সৃষ্টি'ই মুখর হয়ে উঠেছে। একথা এককভাবে নজরুলের নয়, সকল মানুষের মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হোক্—এই দাবীর ঘোষণায় কবিতার আরম্ভ ও-শেষ। এবং যেদিন পৃথিবী থেকে সমস্ত অত্যাচার, অবিচার ও লাঞ্ছনা শেষ হবে সেদিনই শান্ত হবে সে 'আমি' সত্তা। কবিতার শেষ অংশে এই কথার উল্লেখ আছে বলে কবিতাটির ঐ অংশ বিশেষেই উৎপীড়িত মানুষের কথা আছে অন্যত্র নেই, একথা ভাবাও ঠিক না।১৫

আসলে 'বিদ্রোহী' কবিতার আদ্যন্ত এক সমাজসচেতন মানুষের তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছে।

[নজরুল তাঁর কবিসত্তার ইতিবৃত্ত সমীক্ষায় এক জায়গায় বলেছেন :

"হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে— এই অসাম্য, এই বিভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।"]১৬

এই বিদ্রোহী সত্তার সৃষ্টি হয়েছে যে কারণে তার নিরশন ঘটলে মাত্রই সে শান্ত হবে। নতুবা চিরবিদ্রোহী সত্তার ক্ষান্তি নেই। শেষ সওগাত কাব্যের চিরবিদ্রোহী কবিতায়ও এই কথারই স্পষ্ট স্বীকৃতি :

"বিশৃংখল সৃষ্টি তোমার, তাইতো কাঁদে আমার প্রাণ
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।

নজরুলের বিদ্রোহীসত্তার এই সামগ্রিক পরিচয় না নিয়েই সমালোচক লেখেন—"চিরবিদ্রোহী কবি যখন শান্ত হবার কথা বলেন তখন কবিতায় প্রবল ও প্রদীপ্ত বিদ্রোহের মহনীয়তা সব খর্ব হয়ে যায় নাকি ?১৭

এজাতীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। নজরুল যে রুদ্র ও মধুর অশান্ত ও শান্ত একথা বারবার বলতে চান 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠে তা সহজে অনুভব করা যায় :

* আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত, দারুন স্বেচ্ছাচারী।

* আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা

কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা—

* মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য,

কিংবা * আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী······

আমি মরু নির্ঝর ঝরঝর আমি শ্যামলিমা ছায়াছবি ; পর্যন্ত দীর্ঘ অংশে বিদ্রোহীর অন্তর লোকর মাধুর্যের পরিচয় উৎকীর্ণ। একে অস্বীকার করবে কে ? প্রসঙ্গতঃ 'ঝড়' কবিতার শেষ অংশও স্মরণীয় যা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে : 'আমি ঝড় ? ঝড় আমি ?

না, না আমি বাদলের বায়'।১৮

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হয়তো সমকালীন সমাজভাবনার দ্বারা গ্রস্ত বলেই কিছুটা অনুরূপ ভঙ্গী তাঁর 'দুঃখবাদী' মানসিকতায় প্রকাশ করেছেন। আসলে সমকালের সমাজ জিজ্ঞাসায় যে বিদ্রোহ, সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি অভিমান-মুখরতা, পরাধীন, পদানত ভারতবাসীর চিরকালের ধর্মবিশ্বাসী মনে জাগ্রত হচ্ছিল (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) বাংলা সাহিত্যে নজরুলের মধ্যেই তার বলিষ্ঠ ও তীব্রতম অভিব্যক্তি। একটি বিশিষ্ট ও দার্শনিক রূপায়ণ।

এ কথা তো সত্য যে, কোনো একটি বিশিষ্ট দার্শনিকতা হঠাৎ একজন প্রবক্তার দ্বারা প্রচারিত হয় না। দীর্ঘদিন ধরে তা একটি জাতি, সম্প্রদায় ও মানব গোষ্ঠীর চেতনার আকাশে টুকরো টুকরো বাষ্পায়িত মেঘের মত কুণ্ডলিত হতে থাকে। তারপর বিশেষ এক শক্তিমান কবি শিল্পী বা দার্শনিকের হাতে উপযুক্ত পরিবেশে নেমে আসে বৃষ্টিধারার মতো। সৃষ্টি হয় কাব্য-মহাকাব্য, শিল্পকর্ম বা জন্ম নেয় বিশেষ কোনো দার্শনিক মতবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর রেঁনেসা-পুষ্ট শিক্ষিত সমাজে যে ধর্ম জিজ্ঞাসা ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মাইকেলকে পেয়েছিলাম আমরা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই এই অর্থে

যুগেরই সৃষ্টি। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীও এককভাবে নজরুলের সৃষ্টি হলেও আসলে তা সমকালীন যুগমানস ও যুবমানসেরই এলোমেলো ভাবনার 'প্রবন্ধ' রূপ। 'বিদ্রোহী' পড়া কমবয়সী বুদ্ধদেবের অনুভব প্রমাণ করে সমকালীন প্রেক্ষাপটে কবিতাটির বীজ নিহিত ছিল। "ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে যার অভিঘাতে ম্লানতম মফস্বলও থরথর করে কেঁপে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হয়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশ শুদ্ধ লোক যেন সব খোয়াবার মন্ত্রে ক্ষেপে গেলো।

সে সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না হয়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহলে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারী গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে।...

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা আমার কাছে পৌঁছলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে—মনে হোল এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে, সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো এ যেন তাই ; দেশব্যাপী উত্তেজনার এই যেন বাণী।[১৯]

নজরুলের বিদ্রোহী দর্শনের মূলে সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষাপট নিশ্চিতভাবে বর্তমান। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুনিয়া-জোড়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিস্তার, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নূতন চেতনার উন্মেষ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মুসলমান অংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন এবং ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর সাথে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘাত, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দর্শন চিন্তায় নূতন দিগন্ত খুলে দেয়।"[২০]

এই দর্শন চিন্তায় উর্দু কবি ইকবালের (১৮৭৩-১৯৩৮) প্রভাব অনস্বীকার্য। নজরুল ইকবালের কোনো রচনাংশের অনুবাদ করেননি বটে—ফার্সী বা উর্দু—কোনো রচনারই। তবে তিনি যে ফার্সিতে লেখা ইকবালের উল্লেখযোগ্য কাব্য 'শিকোয়া' পাঠ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সমস্ত বিদ্রোহাত্মক রচনায়। তাছাড়া, মহম্মদ সুলতানের অনূদিত শিকোয়া ও জওয়াবে শিকোয়ার ভূমিকায় তিনি মূল গ্রন্থের সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে পাঠ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন:[২১] "সুলতানের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার কাব্যানুবাদ পড়লাম শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে।"[২২] এছাড়া ইকবালের 'আসরারে

খুদি' কাব্যটির পরোক্ষ ছায়া নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় সুস্পষ্ট। যদিও আসরারে খুদির তীব্র ইসলামপ্রীতি 'বিদ্রোহী'তে নেই। তবে আত্মা (self)-র গভীর মূল্যবোধ উভয়ত স্বীকৃত। ডঃ মযহারুল ইসলামের মতে, "আসরারে খুদির প্রথম দিকে আমি বা ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের সাথে চিন্তার দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। Great men think alike—সুতরাং নজরুল ইকবালের প্রভাবের স্পর্শমাত্র না পেয়েও যে এমন একটা মৌলিক চিন্তাধারার পথ খুলে দিতে পারতেন না, এমন নয়।" ২৩ "আসরারে খুদি'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইকবালের বক্তব্য: 'ইনসানের আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-সম্মানবোধ জাগ্রত হওয়া দরকার। যার মধ্যে তা আছে সেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।' ৫ম অধ্যায়ে লিখলেন, যে মানুষের মধ্যে আত্মবোধ (খুদি) আছে তার ভিক্ষা চাওয়া উচিত নয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে আত্মবোধ (খুদি) যদি প্রেমের (কর্মের আর্তি) দ্বারা হয় সুদৃঢ় তবে পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।২৪ এই জাতীয় ভাবনা 'বিদ্রোহী' কবিতার মর্মমূলে বিস্থিত। 'বিদ্রোহী' কবিতায় মোহিতলাল তাঁর 'আমি' নিবন্ধের দাবীদাওয়া আনছিলেন যখন, তখন কেন যে নজরুল ইকবাল প্রসঙ্গ একবারও তোলেননি বুঝি না। বর্তমান মুজফ্‌ফর আহম্মদের বিতর্কের পরে২৫ ও এ কথাটুকু যোগ করা চলে যে 'বিদ্রোহী'-তে মোহিতলাল যতটুকু আছেন (যদি আদৌ থেকে থাকেন) তার চাইতে অনেকগুণ বেশী ও গভীরভাবে আছেন ইকবাল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর 'বিদ্রোহী'তে হুইটম্যানের 'Song of Myself'-এর প্রভাব সম্বন্ধে আতাউর রহমান সাহেবের বক্তব্যও ও যথার্থ বলে মনে হয়:

"বিদ্রোহীতে উল্লাস, উদ্দীপনা. চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও কোলাহল বর্তমান, পক্ষান্তরে 'সন্‌গ অফ মাইসেল্‌ফ্‌'-এ হৃদয়াবেগের সঙ্গে মিশেছে সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা ও দার্শনিকতা। হুইটম্যান মননপ্রধান, নজরুল আবেগপ্রবণ।

১) I am satisfied — I see, dance, laugh, sing.

২) I know I am deathless.

৩) I know I am august.

৪) I exist as I am, that is enough.

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি 'বিদ্রোহী'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে হুইটম্যান অনেক বেশী বিস্তৃত, ব্যাপক ও গভীর।"২৬

সমকালীন যে রাজনৈতিক দর্শন ইকবালের মধ্যে (উর্দু ও ফার্সি কাব্যে) রূপান্বিত হয়েছিল সমসাময়িক নজরুলও ছিলেন তার শরিক ও সমর্থক। নজরুল ইকবালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—

* ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাবএবং গভীর মানবতাবাদ।
* হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ব্যাপারে আস্থাশীলতা।২৭
* এবং একই সঙ্গে মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়নের প্রয়াস।
* মুসলমানদের বর্তমান দুর্গতিতে বেদনাবোধ ও উজ্জীবনের পন্থা নির্দেশ (শেষ তিনটি চিন্তা অন্য প্রবন্ধে আলোচ্য)।

ইকবালের মানবতাবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাবের মিলিত রূপ নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনকে গড়ে তুলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহী আত্মা যেন ইকবালেরই ঈপ্সিত ঘোষণার প্রকাশ। তুলনীয় দুই কবির রচনাংশ আশ্চর্যজনকভাবে স্বগোত্রীয় বলে মনে হয়। ইকবাল বলেন—

* নিজেকে নিক্ষেপ কর অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের মত।
* অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ কর বিশ্ব তোমার আভায় দগ্ধ কর পৃথিবীকে নিজের দহনে।২৮

'ঝড়' কবিতায় নজরুলকে বলতে শুনি :

* আমি বলি নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালাকুণ্ড সূর্যের হাম্মামে২৯

'বিদ্রোহী' কবিতায় শোনালেন :

* আমি দাবানল দাহ, দহন করিব বিশ্ব।৩০

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও সঙ্গীতে রস সমীকরণেও ভারতীয় আলংকারিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এর মূলেও সম্ভবত ফার্সি বা উর্দু সাহিত্য। মূলত ইকবালের কবিতাবলীর প্রভাব থাকা সম্ভব। বাঙালীর স্বভাবসুলভ কারুণ্যে, মাইকেলের বীররসে গীত গাইবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। হয়তো তা কিছুটা কবির অনিচ্ছায়। নজরুলের কাব্যে কিন্তু বীর তথা রুদ্র রসের সঙ্গে করুণ নয় কেবল মধুর রসেরও মিশ্রণ ঘটেছে এবং তা কবির স্বেচ্ছায়।

এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এরূপ ঘটনায়ও আমাদের কাব্যবোধ পীড়িত হয়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা বিদ্রোহী কবিতার সেই বিখ্যাত অংশটিই উদ্ধার করতে চাই :

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেনী তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদিসরোসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্যি!

... ...

আমি অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর থর থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কনকন্।৩১

এই মধুর রুদ্রের মিলিত বর্ণনায় বাংলা কাব্যে নতুন যে আস্বাদন-যোগ্যতা যুক্ত হয়েছে তাই নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনকে আস্বাদ্য করে তুলেছে ইকবালের মত। মধুর রসের মতো রুদ্র রস ইকবালেও প্রাপ্তব্য:

* প্রেমপন্থী চিত্ত মোর, এ ক্রন্দন প্রকৃতি আমার
রোজ হাসরের মত শব্দিত ঝঞ্ঝায় আমি শুনি একা নৈঃশব্দের সুর।
* সবুজে শ্যামলে মোর মনোহর অরণ্য সুন্দর,
আমার বসন প্রান্তে সুপ্ত আজো সংখ্যাহীন গোলাব কুঁড়িরা।
* আমার ক্রন্দন ধারে শিশির সিঞ্চিত হল গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা।৩২

নজরুলের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায়ও এই 'পুষ্পল উত্তেজনা' খুঁজে পাই:

ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে।
আজ হাসল আগুন, শ্বসলো ফাগুন,
মদন মারে খুন মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌বাসে
গো দিক বালিকার পীতবাসে।৩৩

অথচ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত এই রুদ্র ও মধুর রসের সমীকরণে কবিতার রস-হানির কথা উল্লেখ করেছেন।৩৪ কিন্তু জীবনের বেগবান ব্যাপ্তিতে, বীররসের মধ্যে মধুর রস-মিশ্রিত হয়ে কাব্যিক দীপ্তি যে বৃদ্ধি করে তার প্রমাণ গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ড কিংবা মহাভারতের একাধিক বর্ণনা। এই নিরাসক্ত বর্ণনা

রচনাকে মহাকাব্যিক মহিমা দান করতে সহায়ক হয়। বিদ্রোহী কবিতায়ও এই রস সমীকরণকে এই ব্যাপ্ত ও নিরাসক্ত জীবনবোধের আলোকে দেখতে হবে। সেখানে মিশে গেছে রুদ্র ও মধুর হৃদয়াবেগ। মৃত প্রিয়া সতীর দেহধারী শিবের তাণ্ডব নৃত্যের দৃশ্যে অসীম প্রেমময় 'শিব' ও অসহ শক্তিময় রুদ্রের যুগ্ম-চিত্র স্মরণে রাখলে বোধকরি নজরুলের এই বিদ্রোহী চিত্রটি আমাদের সম্যক উপলব্ধ হবে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ মনোভাবে ইকবালকে বলতে শুনেছি—"তোমরা যখন বিদেশীর কাছে নতমস্তক হয়েছ, তখন তোমরা তোমাদের দেহমন খুইয়েছো।" ৩৫ এই ভাবনার সঙ্গে নজরুলের "উন্নতশির', 'খাড়া গর্দান' কিংবা 'আপনারে ছাড়া করি না কারেও কুর্নিশ"—মিলিয়ে যদি পড়ি তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা কার বিরুদ্ধে মাথা উন্নত করে দাঁড়িয়ে। অন্য প্রসঙ্গে নজরুলকে বলতে শুনি—

তুমি জান এ সত্যবাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না ; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত।৩৬

'চিরনির্ভয়' কবিতায় লিখলেন :

তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপ্লব', বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া।
... ...
কোনো আসমান কোনো গ্রহতারা কোনো আবরণ মোরে,
কোনো শৃংখল কোনো কারাগার রাখিতে নারিবে ধরে।৩৭

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায়

আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম,
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু দোহাই হুজুর-মলাম মলাম।৩৮

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই কবির আক্রম্য এই কবিতায়। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে তার তাঁবেদারি করা এবং ধর্ম পালনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই দরকারী কাজ বলে কবির মনে হয়েছে। তাই শুনি তাঁর ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর :

উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি
হিজরে ভীরুর ধর্মকথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি।৩৯

নজরুলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অন্যতম কবিতা 'ফরিয়াদ'-এর মধ্যেও

ইকবালের শেকোয়ার স্পষ্ট অনুরণন। (লক্ষণীয় 'ফরিয়াদ' শব্দের সঙ্গে শেকোয়ার শব্দগত মিল) অবশ্য শেকোয়ায় ইসলামের প্রতি ঈশ্বরের যে একদা করুণা ও সাম্প্রতিক বিরাগের কথা আছে, 'ফরিয়াদ' কবিতায় তা নেই। 'ফরিয়াদ' কবিতায় ইসলামিক প্রসঙ্গ বাদ রেখে নজরুল কেবল ঈশ্বরের পৃথিবীতে ঈশ্বরভক্তের পীড়িত, নির্যাতিত দশার কথা বারবার বলতে চেয়েছেন। এবং ঈশ্বরের দরবারে অভিযোগে উর্ধ্বমুখ হয়েছেন এইভাবে :

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ বেণের রৌপ্যচাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান!
পীড়িত মানব পারে নাকো আর, সবে না এ অপমান!

কিংবা

এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান।৪০

ইকবালের 'শেকোয়া'য় শুনি :

কেন সয়ে যাব এ ক্ষতির পালা
লাভের অঙ্ক নির্বিকার?
আগামী দিনের বুক ভ'রে কেন
নেব অতীতের বিষাদ ভার?

নিশ্চুপ কেন রব চিরদিন?

আল্লার নামে নালিশ আমার
হোক এই মুখ ধূলিধূসর।৪১

'ফরিয়াদ' কবিতায়ও নজরুল ভগবানকে দায়ী করেছেন অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসক শোষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে। ইকবাল তো রীতিমত কড়া কথা শুনিয়ে দেন তাঁর প্রভুকে :

"কভী হমসে কভী গৈরোঁসে শনাসায়ী হৈ—
বাত কহনে কী নহী কী তূভী হরজাঈ হৈ।

কখনো আমাদের সঙ্গে কখনো অন্যদের সঙ্গে তোমার ভাব। কথাটা

মুখে আনতে নেই—তুমিও তো হরজাঈ। 'হরজাঈ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সর্বব্যাপী ও সর্বত্রগামী। কিন্তু চলতি ভাষায় কথাটা বহু পুরুষের শয্যাগামিনী অর্থেই ব্যবহার করা হয়।"[২২]

এই সমাজসচেতন, মানবতার পক্ষপাতী নজরুল বিদ্রোহীর বিশিষ্ট এক দর্শনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মদর্শনের সঙ্গে ইকবালের ভাবনার আশ্চর্য মিল দেখতে পাই। 'আসরারে খুদি' কাব্যে ইকবালের চিন্তা:

* বজ্র ও বিদ্যুৎ সুপ্ত সম্মোহিত অন্তরে আমার।
শিলা আর সমতল পিষে ফেলে বয়ে যাই আমি।

* যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমার
সহস্র উষার দীপ্তি সঙ্গোপন মোর বক্ষমাঝে।

[অনুবাদ: ফররুখ আহমদ / ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ইশাকেরা প্রকাশনা, ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৮০, পৃঃ, ৫৪, ৫১]

'বিদ্রোহী' ও 'ঝড়' কবিতায় সুর ও স্বরের সঙ্গে মিলে যায় এই বিশিষ্ট দর্শন। সমালোচক বলেন, নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙালী মুসলমান যখন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে তখন ইকবালের 'শেকোয়া'র সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নজরুলকে ভালো লেগেছিল, ইকবালকে আরও ভালো লাগল। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ কিন্তু সেই দীপ্তির দহন আছে স্নিগ্ধতা নেই। ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই। তাই তা মূলত প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।[২৩]

নজরুলের এই বিদ্রোহ দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেই উপলব্ধ হবে বাংলার সমকালীন কবিদের মধ্যে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বাদে, নজরুল ছিলেন অনেক বেশী জটিল, বহুমুখী ও বেগবান জীবনদর্শনের অধিকারী। অসাধারণ তীব্র আবেগ এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতার বাতাবরণ যুগপৎ তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতায় পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে সাধারণ মানুষের জন্য গভীর মমত্ব ও বেদনাবোধ থেকে জাগ্রত, ভাঙার নেশায় উন্মত্ত সুতীব্র উল্লাস। 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য' আক্ষরিক অর্থে তাঁর বিদ্রোহী মেজাজকে প্রকট করে তুলেছিল।

এই বিশিষ্ট মানসিকতায় মানুষকে মহৎ করেছেন দেবতার মত, আর দেবতা তথা ঈশ্বরকে নামিয়ে এনেছেন মাটির মানুষের মধ্যে। এই ভাঙাগড়ার ভেতর

দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন নজরুলের ঈশ্বর। অন্তরলোকে তাঁর শাশ্বত আবাস। ধর্ম, জাতি, বর্ণের উচ্চে নিঃসন্দেহে :

'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল সকলের দেবতার।[৪৪]

সেই ঈশ্বরকে নজরুল শ্রদ্ধা করেন। মানবতার মূর্ত প্রতীক সেই ঈশ্বরকে ধর্ম সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বের করে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি বলেন :

'আপনারে ছাড়া করিনে কারেও কুর্নিশ'[৪৫]

তাঁর দর্শনে—এই 'আমি'-কে কেউ কারাগারে আবদ্ধ রাখতে পারে না। কেননা সে যে স্বয়ংই 'তরুণ ঈশান'। তাই কবি গেয়ে ওঠেন :

হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি ?
শিখায় এ হীন মন্ত্র কেরে ?[৪৬]

আর সেই এক আল্লাহ ছাড়া কারোর বান্দা না হবার কথা তিনি শোনান বারবার। এই স্তর অবধি পৌঁছতে পারলে নজরুলের বিদ্রোহের সঙ্গেও ইকবালের মত 'ধর্মের স্থির সত্যের সাযুজ্য ও সঙ্গতি আবিষ্কার করা যেতে পারে। তখন আর নজরুলের বিদ্রোহে কেবল দহনজ্বালাই দেখবো না (সৈয়দ আলী আহসান যেমন দেখছেন) দেখবো প্রশান্ত ও অতুলনীয় জীবনানুভূতি। যে অনুভূতি থেকে নজরুলকেও লিখতে হয় :

"আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিওনা নীচু ?
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বান্দা হবেনা, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল।

... ...

এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে করোনা কারেও ভয়
দেখিবে অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয়।"[৪৭]

নজরুলের এই বিদ্রোহ দর্শনে আমরা আগেই বলেছি, যুক্ত হয়ে আছে গভীর মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদের সাথে পরিচিত না হলে নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনের বোধ অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। ইকবালের মানবতাবাদী চিন্তার সঙ্গে নজরুলের মানবিকতাবাদেরও সাযুজ্য বর্তমান। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, রুশ বিপ্লব, রাশিয়ার মহাঅভ্যুত্থানের সঙ্গে ইকবাল ও নজরুল উভয়ে পরিচিত ছিলেন। চাষী মজুর শ্রমিকের উত্থান, তাদের সোচ্চার দাবী উভয়েই স্বীকার

করেছেন, প্রচারও করেছেন। কিন্তু কেউই ছিলেন না আক্ষরিক অর্থে মার্কসীয় দর্শনের প্রায়োগিকতায় চেষ্টিত। কার্ল মার্কসের উদ্দেশ্যে ইকবাল কবিতা লিখলেও সেখানে মার্কসকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো রূপ প্রশংসা করেননি।৪৮ নজরুল সম্বন্ধেও সমালোচক বলেন, নজরুল লেনিনের বিদ্রোহের তথা বিপ্লবের দিকটার দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাত্ত্বিক সাম্যবাদের দিকটায় আকৃষ্ট ছিলেন না।৪৯ কেননা ইকবাল এই মানবতার পথ বেয়ে চলে গিয়েছিলেন অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের ভাবনায় আর নজরুল ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণাসূত্রে Mysticism-এর প্রশান্তিতে। তবু একথা সত্য যে মানবতাবাদী ভাবনা উভয় কবিকে কাছাকাছি এনেছিল। উভয়ের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল এক জ্বলন্ত অশান্তি, এক অন্তহীন অসুখ! এবং এর মূলে মার্কসীয় দর্শন গভীর ও প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় মার্কসীয় ভাবনার স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাব আমরা, আর 'ফরমান-ই-খুদী' কবিতায় ইকবালও লিখেছেন ঃ

ওঠ, দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।
... ...
কিষাণ মজুর পায়না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।৫০

কিষাণ মজুর দরিদ্র মানুষের জীবনের সাথে পরিচিত নজরুলও সাম্যের গান গেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য-কঠিন কৈশোরিক অভিজ্ঞতা, যৌবনে রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীর পড়াশুনা এবং কর্মজীবনের সূচনায় বন্ধু মুজফফর আহম্মদের মত কম্যুনিস্ট নেতার সংসর্গ ঘটেছিল বলেই নজরুল নিপীড়িত মানুষের অন্তর-লোকের বেদনাকে উপলব্ধি করেছিলেন সম্যকভাবে। ইকবালের সাহিত্য-সৃষ্টিও হয়তো তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইকবালের হাত ধরে নজরুল এই মানবতার দীক্ষা নেননি এটা সত্য। কেবল মনে রাখা দরকার—নজরুল ও ইকবাল কত কাছাকাছি ছিলেন নিপীড়িত মানবজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বার্থ ও পরিশ্রমের। কত দরদী।

নজরুল লিখেছেন ঃ

দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।
যতদিন মোর লেখার শক্তি রবে
যতদিন আমি বেঁচে রব এই ভবে
উহাদেরি কথা লিখিয়া যাইব, কহিব ওদেরি কথা।৫১

'দারিদ্র্য' কবিতায়ও এই দারিদ্র্যকে মহত্তম মর্যাদায় উন্নীত করে দেখেছেন কবি। 'দারিদ্র্য' কবিতার সৃষ্টি সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন আজীজ আল আমান সাহেব:

"কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন সময়ে কবি নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন। আর কোন্ দিনই বা তাঁর অবস্থা সচ্ছল ছিল! দারিদ্র্য কবিতাটি এই সময়ে রচিত।"[৫২]

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ, কল্লোল (৪র্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা) পত্রিকায় দারিদ্র্য কবিতাটি মুদ্রিত হয়। ডি. এম্. লাইব্রেরীর সঞ্চিতা নূতন সংস্করণে (১৩৯১) কবিতাটির রচনা তারিখ দেওয়া আছে—২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৩। (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও 'কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে এই তারিখ দিয়েছেন, পৃঃ ১০৪, এ মুখার্জী) আর মুজফ্‌ফর আহম্মদ বলেছেন কবিতাটি কল্লোলে ছাপা হবার ক'দিন আগেই রচিত।[৫৩] কবিতাটি সিন্ধু হিন্দোল কাব্যের অন্তর্গত।

তথ্য আছে, ১৯২৬ সালের প্রথম থেকেই নজরুল কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এবং যথেষ্ট আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ছিলেন। 'দারিদ্র্য' কবিতার জন্ম এই সময়কার দারিদ্র্যপিষ্ট মানসিকতা থেকে। এই জাতীয় মন্তব্যের আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলতে হয়, নজরুলের আবাল্যের দারিদ্র্যপিষ্ট জীবনবোধই এই কবিতায় ভাষারূপ লাভ করেছে, কেবল কৃষ্ণনগরের দারিদ্র্যদশা থেকে জাত মনোভাব নয়। শুধু তাই নয়, সমকালের লেখা 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে দারিদ্র্যক্লিষ্ট যে সব নরনারীর ছবি দিয়েছেন নজরুল তাও তাঁর চোখের দেখা জগতেরই। এদের জীবন থেকেই উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর—

"দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি।"[৫৪]

অতএব একথা মানতে হবে যে, দারিদ্র্য কবিতায় সেই সময়কার অভাব অনটনের খবর নেই কেবল। এবং নেই এককভাবে অভাবী নজরুলের দারিদ্র্য বন্দনা। কবির সমকালীন নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-বেদ হয়ে উঠেছে এ কবিতা।

কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা সমকালে কাব্যে ও কবিতায় দারিদ্র্যের যে উগ্র ও পৌণঃপুণিক ছবি দিচ্ছিলেন নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতায়ও সেই যুগ প্রেক্ষাপটের কিঞ্চিৎ তাপ যে লাগেনি তা নয়।[৫৫] তবে স্বীকার করতে বাধা নেই

নজরুলের দারিদ্র্য বর্ণনার মধ্যে কেবলই অন্য লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'দেখে লেখা' ব্যাপারটা ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির রম্যরূপায়ণ। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন কল্লোল গোষ্ঠীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত লেখালেখিকে বাড়াবাড়ি বললেন৫৬ তখন আকৈশোর রবীন্দ্রভক্ত নজরুল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সক্ষোভ মন্তব্য করেন :

"তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়তো সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্যযন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন! শুধু এই নির্মমতাটা সইবে না।"৫৭

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত 'দারিদ্র্য' কাবিতাটিকে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলেছেন।৫৮ কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি আরও দুটি প্রশংসা যোগ করেছেন—

* আবেগের সঙ্গে অলংকরণের এক চমৎকার সঙ্গতি।

* স্বাভাবিক রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তববোধের হরগৌরী মিলন।৫৯

আর কবিতাটির বিরুদ্ধে বলেছেন, "ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্নতা কবিতাটির মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে।"৬০ সমালোচনার হাস্যকর আত্মবিরোধটুকু সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না নিশ্চয়ই। গুণের কথা বলতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, (স্বাভাবিক রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তববোধের হরগৌরী মিলন) আবার দোষের কথা বলতে গিয়েও সেই বৈশিষ্ট্যেরই ভাষান্তরিত রূপ (ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্নতা) ব্যবহার করেছেন তিনি। নিরপেক্ষতা রাখতে গিয়ে স্ববিরোধী হয়ে পড়েছেন সমালোচক।

'দারিদ্র্য' কবিতায় অবশ্যই এক রোম্যান্টিক সুন্দর জীবনবোধের স্বপ্ন সম্পন্ন কবি দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়নে বিদ্ধ হবার তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে 'ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্নতা' কোথায়? এবং দারিদ্র্যই পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে কবির। হয়ে উঠেছে 'শৈব সুন্দর'।

ধুতুরা গেলাস/ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস৬১—কবি বলেন। তাই শারদায় সানাই-এর আগমনীতে তিনি শোনেন—'নাই, নাই' ধ্বনি।

'দারিদ্র্য' কবিতায় দারিদ্র্যকে মূর্তিময় করে তুলতে কবি কয়েকটি চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। দর্পী তাপস, ঋষি, ক্ষমাহীন দুর্বাসা, বুভুক্ষু, নির্মম, কাঠুরিয়া ইত্যাদি। এই কবিতায় এক উত্তেজক, জ্বালা ও নেশাযুক্ত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা—কবির জীবনবোধকে প্রকাশ করে। অভাব অনটনমুক্ত জগতের আস্বাদ্য জীবনযাত্রাই কবির কাম্য। নিজের উপলব্ধিকে দারিদ্র্যের

জবানীতে বলিয়ে দিয়েছেন কবি। দারিদ্র্যের মুখ থেকে যে শিল্পীত সত্য বেরিয়ে আসে তা আসলে কবিরই অভিজ্ঞতা।

" মূঢ় শোন্
ধরণী বিলাসকুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যা তলে বাহুতে প্রিয়ার
তাই এবে কর ভোগ।"৬২

বিলাসের আড়াল নয়, অভাবের অলজ্জাই মানুষকে দেয় বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশের দুরন্ত সাহস ও শক্তি। উপলব্ধিতে জাগায় মরণবরণের পৈশাচিক উল্লাস।

সমাজসচেতন কবি বাংলা দেশের এক উল্লেখযোগ্য উৎসব—দুর্গাপূজার পট-ভূমিকায় শারদপ্রকৃতির রূপ মাধুর্যের প্রেক্ষাপটে এনেছেন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের অনুষঙ্গ। আর চতুর্দিকের এ আনন্দ সমারোহে এই মিলনের মহালগ্নে কবি বলেন, 'মোর অধিকার/আনন্দের নাহি নাহি। দারিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ/আমার দুয়ার ধরি।'৬৩ সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যদি কোনো সৌন্দর্য থেকে থাকে তবে তা এইখানে—এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মদির পরিবেশে সুর ভঙ্গের, বেসুর বীণার মত বেজে ওঠার বিরুদ্ধ রসাবেদনে।

অক্ষরবৃত্তে নজরুলের শিল্পসার্থকতা কমই। তবে 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুলের সেই বিরল সার্থকতার অন্যতম প্রমাণ। দারিদ্র্য কবিতার সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং শব্দ ও চিত্রকল্পের সুচিন্তিত ব্যবহার কবিতাটিকে নজরুলের উল্লেখ্য কবিতালীর অন্তর্গত করেছে। কবিতার শেষে কয়েকটি পংক্তি (কে বাজাবে বাঁশী? /কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি? /কোথা পুষ্পাসব?)৬৪ একই ছন্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপের' (১৮৯৪) কিছু অংশের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। যদিও দুটি রচনার ভাববস্তুর তুলনা চলে না তবু বিশেষ ভঙ্গিটুকু তুলনীয়:

"তাই বলে স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুর ললনার?
... ...
হাসি? হায় সখা, এতো স্বর্গপুরী নয়
পুষ্পেকীটসম হেথা বাঞ্ছা জেগে রয়
মর্মমাঝে.........
হেথায় সুলভ নহে হাসি।"৬৫

কবিতাটির ছন্দ সম্বন্ধে সবশেষে একটি বিরুদ্ধ কথা না বললেই নয়। কবিতাটির ৮+৬-এর মাত্রাবিন্যাসে রচিত প্রবহমান পয়ারের ধরন অনেক সময় ক্লান্তিকর। কেননা, কবিতাটিতে ভাবের প্রবহমানতা বেশীক্ষণ বজায় থাকেনি। যে কোনো প্রথম পংক্তির শেষ ৬ মাত্রার পর্ব থেকে পরবর্তী পংক্তির প্রথম ৮ মাত্রার পর্বের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় ভাবনা খণ্ডিত, তথা সমাপ্ত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ছন্দ যেমন সুদীর্ঘ প্রবহমানতার দরুণ আবেগবহ ও অক্লান্ত হতে পেরেছে, দারিদ্র্য কবিতায় তা আনতে সক্ষম হননি নজরুল। সতর্ক পাঠে ছন্দের ব্যাকরণ-অতিক্রমী এই ত্রুটি সংবেদনশীল কানে ধরা পড়বেই।

'দারিদ্র্য' কবিতার সূত্র ধরে আমাদের মনে পড়ে যাবে নজরুলের আরো কিছু মানবদরদী কবিতা ও গানের প্রসঙ্গ। 'দারিদ্র্য' কবিতায় তাঁর বক্তব্য ছিল, সর্বহারা বলেই দরিদ্রের উন্নতশির বিদ্রোহী হতে কোনো বাধা নেই। মার্কস ও এঙ্গেলস্ বলেছেন, 'শৃংখল ছাড়া প্রোলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য রয়েছে সারাজগৎ'।

[মার্কস+এঙ্গেল্স, কমুনিষ্ট পার্টির ইশতেহার, মূল গ্রন্থ, কার্ল মার্কস ফেডারিক এঙ্গেলস-রচনা সংকলন, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনা, মস্কো, পৃঃ ৫৭] এই সর্বহারাদের চারণ কবি নজরুলও মিছিলে-মিটিং-এ গান গেয়েছেন :

"ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি ভালো করেই মরব এবার চল ॥
(তুলনীয় : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'ফেমিন রিলিফ' কবিতা)

... ...

আজ জাগরে কিষাণ! সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়?
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।"৬৬

আর একটি কবিতায়ও শোনালেন এই চাষীদের জাগরণের কথা :

"তোর হাঁড়ির ভাতে দিন রাতে যে দস্যুদের হাত
তোর রক্ত শুষে হোলো বণিক : হল ধনীর জাত
তাদের হাড়ে ঘূণ ধরাবে তোদের এই হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার।৬৭

কয়লাখনির দেশের কবি দেখিয়ে দিলেন হাতুড়ী শাবল ধরা শ্রমিকদের বাস্তব রূপ। অহ্বান জানালেন তাদের :

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে, কয়লাখনির বয়লা ঠেলে,
যে অগ্নি দিই দিখিদিকে জ্বেলেরে,
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা কাটা ময়লা কুলির সেই অনল
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।৬৮

'শ্রমিক মজুর' কবিতায় লেখেন নজরুল :

যে বাড়ীতে থাক, তার প্রতি ইঁটে রক্ত মাখানো কার ?
... ...
মজুর তোমায় মজুরি করিয়া নজরানা পায় কত ?
... ...
রাজমিস্ত্রীরা রাজবাড়ী গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা,
আমাদের চালে খড় নাই একি পারিশ্রমিক সাজা ?
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন ?
কেন এ অভাব, রোগ দারিদ্র্য চিত্ত গ্লানি মলিন ?
শিক্ষা পাই না দীক্ষা পাই না, ক্ষুদ্র কি তাই বলে ?
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জ্যোতি জ্বলে।৬৯

এই জ্যোতিষ্মান আত্মার সম্মিলিত বিপ্লব কবির কাঙ্ক্ষিত। রাজনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে নয় শুধু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও কবির সোচ্চার বিদ্রোহ। অর্থনৈতিক সাম্যর স্বপ্নে কবি লেখেন :

'মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কবজি শক্ত কর,
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর।৭০

একই ভাবনার প্রতিধ্বনি অনেক বেশী মাত্রায় শিল্পিত রূপে বেজেছে 'কুলি মজুর' কবিতায়। 'কুলি মজুর' কবিতায় মানবতার অসম্মানে ও লাঞ্ছনায় বিক্ষুব্ধ কবি সত্তার সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কবিতা গুচ্ছের সর্বশেষ কবিতা 'কুলিমজুর'। 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ রচনার সময় কবির কার্যাবলীর একটু পরিচয় গ্রহণ দরকার যা কিনা ঐ কবিতাগুচ্ছ রচনার পটভূমি নির্মাণ করেছিল।

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসের দিকে নজরুল এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু (কুতুব উদ্দীন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়ন) The

Labour Swaraj Party of the Indian National Congress গঠন করেন। এই দলের প্রথম ইশ্‌তেহার কাজী নজরুল ইসলামের দস্তখতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পার্টির মুখপত্ররূপে ১৯২৫-এর ২৫ ডিসেম্বর লাঙল-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার জন্যও রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাটি হল—

জাগো জাগো বলরাম
ধরো তব মরুভাঙা হল
প্রাণ দাও, শক্তি দাও
স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল।

লাঙলের প্রতি সংখ্যায় প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীটি ছাপা থাকত।৭১ প্রধান পরিচালক নজরুল এবং সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল 'সাম্যবাদী'। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তথ্য দিয়েছেন সাম্যবাদী। রুশভাষায় অনূদিত হয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন।৭২ 'সাম্যবাদী' হুগলীতে থাকাকালীন রচনা। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ মার্কসীয় প্রোলেতারিয়েতের ভাবনারই প্রকাশ মনে হয়।

সাম্যবাদী রচনাকালে তাঁর এক গুণমুগ্ধ পাঠককে লিখেছেন: "আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানিনা লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা।……আমার লেখার উদ্দামতা হয়তো কমে আসছে—তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার সাম্যবাদী পড়েছেন? ……আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশীবাদকের বিদায় পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতর সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার 'সাম্যবাদী'-তে পাবেন।"৭৩ 'কুলিমজুর' কবিতায় নজরুল অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত মানুষের সপক্ষে যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এবং যেভাবে শোষিত মানুষের ছবি এঁকেছেন তাতে তার ভাবনায় মার্কসীয় অর্থনীতির প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। শ্রমিককে বেতন দেবার নামে যে প্রতারণা করা হয় মার্কসের মত নজরুলেরও তা মনে হয়। নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিককে খাটিয়ে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে ধনিকদের মুনাফা এবং মূলধন বৃদ্ধির উৎস। নজরুল লিখেছেন:

"বেতন দিয়াছ চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল।"৭৪

"মার্কস মূলধনের গায়ে দেখেছেন 'রক্ত আর ক্লেদ', নজরুল দেখেছেন ধনীদের প্রাসাদে শ্রমিকের রক্ত।"৭৫

……………তোমার অট্টালিকা

কার খুনে রাঙা? ঝুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।"৭৬

শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী শ্রমের মূল্যেই ধনিক সভ্যতার রেল, স্টীমার, কলকারখানা, গগনচুম্বী, মিনার প্রতিষ্ঠিত। ফলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদের ওপর থাকার কথা যাদের পরিশ্রমে পরিণতি লাভ করেছে সভ্যতার এত উন্নতি :

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগালো ধূলি
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান।
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।…
সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।৭৭…

অর্থনৈতিক শ্রেণী-সচেতনতা নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় থাকলেও 'সাম্য-বাদী'র অন্তর্গত কুলিমজুর কবিতাটিই অধিকতর শিল্পসার্থক। নিখিলের বেদনা আর্ত পীড়িত মানুষের খুন মেখে যে রক্তিম অরুনোদয়ের স্বপ্ন দেখেছেন নজরুল তা পরবর্তী কবি সুকান্তের প্রত্যক্ষ কম্যুনিষ্ট ভাবনার কবিতাগুলির পূর্বসূরী নিঃসন্দেহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুকান্ত তাঁর কাব্যসম্ভারের কোথাও তীব্র জীবন সংরাগের কবিতা রচয়িতা নজরুলের নাম পর্যন্ত করেননি। গান্ধিজীকে নিয়ে কবিতা লিখলেও সুকান্ত নজরুল সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতার কারণ বোধ করি ঘোর কম্যুনিষ্ট সুকান্তর কংগ্রেসের সাহায্যপ্রত্যাশী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ ৭৮ বা অবশেষে আধ্যাত্মিকতায় আশ্রিত নজরুল সম্বন্ধে অনীহা।

যাই হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি সচেতন বামপন্থী কবিতা রচয়িতা হিসাবে নজরুলই দুঃসাহসী পথিকৃৎ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায় সমকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর দুঃখবাদী কবিতাগুলি লিখেছিলেন কিন্তু সেখানে প্রত্যক্ষ কোনো সামাজিক শ্রেণীচেতনা বা রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছায়া ফেলেনি। নজরুলই এ ব্যাপারে সচেতন কর্মী। শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণ নয়, নজরুল চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে বিভেদের বেড়াজাল তুলে দিতে। এই বিভেদের জাল মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে—তিনি বুঝে-

ছিলেন। মানুষের অহমিকা, জাত্যাভিমান, অন্ধসংস্কার সমাজে সৃষ্টি করেছে গভীরতর সব সমস্যার। আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার আমূল বদলাবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন কবি। তাই 'সাম্যবাদী'র কয়েকটি উল্লেখ্য কবিতায় তিনি নির্বাচন করেছেন—কবিতার মুখবন্ধে—আমাদের জীবনবোধেরই আলোচনা। উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নয় এসব কবিতা বলা বাহুল্য। এবং বস্তুবাদী সাহিত্য বিচারের মূল্য স্বীকার করলে এইসব রচনার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। এবং এও স্বীকার করতে হবে, এই জাতীয় প্রত্যক্ষ সমস্যাবলী নিয়ে সরাসরি বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নজরুল একাই। আর বোধ করি কবিতার আঙ্গিকে সেই যুদ্ধ ঘোষণা যতখানি শিল্প সার্থক হওয়া সম্ভব, নজরুল সেই সম্ভাব্যতা স্পর্শ করেছেন।

'সাম্যবাদী'র অন্তর্গত কবিতাগুলির বক্তব্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :

(১) সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। (কুলিমজুর)

(২) সৃষ্টিকে অবহেলা করে ঈশ্বরানুসন্ধানের মধ্যে মানুষের যে বিভ্রান্তি সে সম্বন্ধে মন্তব্য। (ঈশ্বর)

(৩) মানুষ এবং দেবতার সম্পর্ক। অর্থাৎ মানুষকে অবজ্ঞা করে দেবতার মন্দির মসজিদে তাঁর অনুসন্ধান ও অর্চনা, আর দরিদ্র মানুষকে অবহেলা করে যে মোল্লাতন্ত্র তার বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ। (মানুষ)

(৪) রূপরস সৌন্দর্যময় এই পৃথিবী, কামনাময় এই বসুন্ধরায় মানুষ অসহায়ভাবে আত্মসমর্পিত। মাটির স্বাভাবিক আকর্ষণেই মানুষ মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত। এরূপ অবস্থায় মানুষ নয় কেবল স্বর্গীয় ফেরেস্তারও মোহাবিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী—এ জাতীয় জীবন সংরাগময় সত্যবচন উচ্চারণ করার দুঃসাহস। (পাপ)

(৫) সমাজে বারাঙ্গনা যেহেতু কামনাময়ী নারী তাই কামনার পঙ্ককুণ্ড বারাঙ্গনাকে ঘৃণা করাই স্বভাবধর্ম আমাদের। নজরুলের বক্তব্য, এই কামনা সৃষ্টি-মূলে, আমাদের জন্মের ইতিহাসে বিজড়িত। অতএব বারাঙ্গনাকে ঘৃণা করার অধিকার আমাদের নেই। (বারাঙ্গনা)

(৬) আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধিকার সংকুচিত ও খর্ব। (মুসলমান সমাজে তো নারীকে পর্দার অন্তরালে বন্দিনী করে দেওয়া হয়েছে।) নারীকে অশিক্ষা, অন্ধ কু-সংস্কার ও অবজ্ঞার মধ্যে রাখার বিরুদ্ধে নজরুল। আমাদের সভ্যতার মর্মে মধুরস ও সৌন্দর্য-সঞ্চারে নারীর

ভূমিকা ব্যক্ত করেন কবি। 'কুলিমজুর' কবিতার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত। বর্তমানে সাম্যবাদীর দ্বিতীয় বক্তব্য-থেকে আমাদের আলোচনা।

(২) ঈশ্বর তথা স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিত্য প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের মানব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি সম্বন্ধ কিংবা সুফী ধর্ম সাধনার আন-আল-হক তত্ত্বের সঙ্গে নজরুলের সুপরিচয়ই এজাতীয় জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ সুফী সাধনায় আন-আল-হক তত্ত্বের উৎস ও প্রবক্তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য জেনে রাখা দরকার। এই তত্ত্বের প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর 'আবুয়াজিদুলবিস্তামি'র মধ্যে। তিনিই প্রথম বিপরীত দিক থেকে ('ফানা' বা) মুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই তত্ত্বের সঙ্গে সুফীদের প্রাথমিক দর্শন ধারার সর্বাত্মক ঈশ্বর ভাবনার কোন দূরত্ব নেই। বিস্তামি বলতেন "আমার এই পরিচ্ছদের (দেহের পরিচ্ছদ?) অন্তরালে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এ আমার মহৎ বিজয় (লাভ), যে আমি কত মহান। অবশ্যই আমি ঈশ্বর, আমাকে ছাড়া ঈশ্বর কোথায়? সুতরাং আমাকেই বন্দনা কর।"৭৯

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সুফী সাধনার প্রথম স্তরের নিরীহ ঈশ্বরানুগত্যের সঙ্গে, অষ্টম শতাব্দীর শেষ ১৪ বছর এবং ৯ম শতাব্দীর ১ম ৬১ বছরের মধ্যে যুক্ত হয়েছিল গ্রীক জীবনবাদ ও দর্শন। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ সুফী দর্শন স্রোতে যুক্ত হল Panthism বা সর্বত্র ব্যপ্ত ঈশ্বরবাদ।৮০ এই ভাবনার সুফী সম্প্রদায় উজদিয়া (Wujudiyya) নামে পরিচিত।৮১ এই সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরবাদের দর্শন ধারায় বিখ্যাত হয়ে আছেন মনসুর। যাঁর পুরো নাম— হুসায়ণ ইবন্ মনসুর অনহালাজ, পেশায় Wool carder। এই পেশা সুবাদেই তিনি হালাজ (Wool carder) নামে পরিচিত। আর যে মনসুর নামে তিনি বিখ্যাত তা আসলে তাঁর পিতার নাম। এই বিখ্যাত মনসুরের কথা নজরুল মাঝে মধ্যে তাঁর রচনায় বলেছেন। মনসুর তীব্র ঈশ্বরানুসঙ্গ বোধ থেকে উচ্চারণ করেছিলেন 'আন আল হক' আমিই সেই সত্য। এই অভিযোগে কেবল ৮ বছর কারাদণ্ডই নয়, হয় তাঁর চরম দণ্ডও।৮২ সুফী মনসুর; হাফিজ, খৈয়ম, আত্তারের ভাবনার সাথে নজরুল পরিচিত ছিলেন। হাফিজ ও খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন নজরুল। আত্তার (ফেরিদউদ্দীন আত্তার)-এর ভাবনা নজরুলে আছে।

আত্তারের রচনা :

"The world is full of thee—

... ...

Thou and thy power are the whole universe" ৮৩

ঈশ্বর কবিতায়ও নজরুল লিখলেন : "সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি", সুফী সাধনার এই তত্ত্বই নজরুলকে দেব ও মানবের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করতে সাহায্য করেছে। শাস্ত্রবিদদের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নয়, হৃদয়ের সত্য অনুভবেই ঈশ্বরের উপলব্ধি—এই কথাই ঈশ্বর কবিতার উপজীব্য। গীতাঞ্জলির ঈশ্বরানুসন্ধান কিংবা বাউলদের ধর্মবোধও নজরুলকে এই বোধের কাছাকাছি করেছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে।

(৩) 'মানুষ' কবিতায় নজরুল ধর্মাচার ও সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র আঘাত হেনেছেন। মন্দির এবং মসজিদের পুরুত ও মোল্লারা যে ক্ষুধার্ত নরদেবতাকে অবজ্ঞা করে ধর্মাচার করে থাকে সেই ফাঁকি ও মেকী কাজের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য রেখেছেন কবি এ কবিতায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের দেয়া নজরুলের বালক জীবনের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা : 'ঈদের উৎসবে গ্রামের মসজিদে মৌলভী সাহেবের কাছে এক মুসলমান ভিক্ষুক কিছু খাবার ভিক্ষা চেয়েছিল। ....মৌলভী সাহেব কিন্তু ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেন। ভিক্ষুকটি মনের দুঃখে ফিরে যাচ্ছিল। বালক নজরুল জানতে পেরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাইয়ে দেন।"৮৪

বালক বয়সের এই অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত প্রতিবাদের জ্বলন্ত কাব্যরূপ দেখা যায়—'মানুষ' কবিতাটিতে। তাই ক্ষোভ এত তীব্র :

'মানুষেরে ঘৃণা করি—

ও কা'রা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!

ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে," ৮৫

মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে দেবতার ঘরে তালা দেবার অধিকার কোন মানুষের নেই।

মানুষই মহত্ত্বের অধিকারী। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই 'অসীম' যে কোন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। কে জানে কাহার অন্ত ও আদি কে পায় কাহার দিশা?' ৮৬ অথচ এই মানুষকে অবজ্ঞা করছে দেব মন্দির ও মসজিদের রক্ষকরা। তারা লুব্ধ। তাদের কামনা তাদের আত্মার অন্ধকারে

নিয়ে যাচ্ছে। দেবতার ঘরে তালা দেবার অধিকার তাদের নেই। তাই কবির আহ্বান :

"খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়
কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে চালা হাতুড়ি
শাবল চালা।"৮৭

'পাপ' কবিতায় ধর্মধ্বজীদের সামনে খুলে দিয়েছেন কবি মানব চরিত্রের সমস্ত অশুভ সত্তাকে। সে পাপকে অস্বীকার করতে পারে না মানুষ, যে পাপ রূপজ আকর্ষণ থেকে, জৈবিক তাগিদ থেকে জাগ্রত। রূপময় এই পৃথিবীর পরতে পরতে আকর্ষণী চুম্বক। এই পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই বিভ্রান্তি জাগে না, হারুত-মারুত-ফেরেস্তার পক্ষেও এই নেশায় ডুবে যাওয়া স্বাভাবিক। এই রূপময় জগতের আসক্তিতে মগ্ন মানুষের জন্য ঈশ্বরের করুণাঘন মূর্তির কল্পনা অভিনব নয় শুধু, অসাধারণও বটে। ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, 'তোমাকে করুণাময় বলবো কি করে, যদি আমার মত পাপীকে তুমি ক্ষমা না কর।' নজরুলের অনুবাদ আছে :

আমরা শরাব পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি ঐ পান্থশালার,
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার,
আমরা যদি পাপ না করি ব্যর্থ হবে তাঁর দয়া
পাপ করি তাই ক্ষমা করে করুণাময় নাম খোদার।৮৮

আর স্বয়ং করুণাময়ের মুখে বাণী দিয়েছেন নজরুল 'পাপ' কবিতায়। অসাধারণ কাব্যিক হয়েছে সেই অংশটি :

"মলিন ধূলার সন্তান ওরা, বড় দুর্বলমান,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা—নয়নে অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে-তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী এখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুলধনু, চোখে চোখে ফুলবাস।"৮৯

অতএব এখানে হারুত মারুত স্বর্গীয় দূতেরা ও নাগরী জোহরার রূপে সংযম বাঁধ হারিয়ে ফেলে। এখানে রমণীর কটাক্ষ লাস্যে ডুবে যায় লক্ষ যুগের

তপস্যা। সর্বশক্তিমান অনঙ্গ ও অনন্ত যৌবনা রতির বিহারক্ষেত্রই মর্ত্য। শিব এখানে হেরে যান বার বার।

(৫) 'বারাঙ্গনা' কবিতায় শরৎচন্দ্রীয় পদ্ধতিতে পতিতা চরিত্রকে মহত্তর করার কাব্যিক অনুপ্রেরণা আছে। বারাঙ্গনাকে মাতৃ সম্বোধনে কবির আন্তরিকতার প্রকাশ যেমন দেখি, তেমনি খুঁজে পাই মানব সমাজের অতীত কাহিনী থেকে ঘৃতাচী, কুন্তী, গঙ্গা, জবালা, অহল্যা, মেরী—প্রভৃতি নারী চরিত্রের প্রসঙ্গ টেনে স্খলিতা চরিত্রা নারীদের মহত্ত্বের দিক স্মরণের প্রবণতা।

বারাঙ্গনার সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি না থাকার বিরুদ্ধে নজরুল সমকালের চাইতে অনেক বেশী অগ্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন: 'জারজ কামজঃ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই'—কেন না পৃথিবীতে নরনারীর কামনার ফসলমাত্র মানুষ। এই ভাবনা প্রকাশের জন্য শনিবারের চিঠিতে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত।[৯০] মোহিতলাল মজুমদারের কটূক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"সম্প্রতি একটি কবিতায় নব সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে একপ্রকার nihilism বা নাস্তিক্য নীতির উল্লাস আছে—ইহা বর্তমান যুগের রসাপিপাসু পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর এবং কামুক; অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস, আমরা সকল ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য মৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'কে বলে তুমি বারাঙ্গনা মা?' বিদ্রোহের চরম হইল বটে। কিন্তু কথাটা দাড়াইল কি? এই উক্তিতে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতুটকু বাড়ে নাই।.........কবি প্রচারিত নব সাম্যবাদ অনুসারে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—তুমিও বারাঙ্গনা, মাও বারাঙ্গনা। অতএব মা-তে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। এই ব্যাখ্যায় বেশীদূর অগ্রসর হইলে অন্তরাত্মা কলুষিত হয়, কিন্তু এই কবিতাটি তরুণদের বড় ভালো লাগিয়াছে। এই যে মনোভাব কেবল সমাজ বিদ্রোহ নয়, ইহা মানুষের মনুষ্যত্ব বিরোধী। ইহা সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ ইহা বলবান মনুষ্য হৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; যে প্রজ্ঞার বলে পরিকল্পনার সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায় সেই প্রজ্ঞা বা শক্তি এখানে একেবারেই নেই। ইহা অলস অবশ মাংসপিণ্ডের আক্ষেপ; রিপুর তাড়না—ইহারই নাম বিদ্রোহ ঘোষণা।"[৯১]

শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গ (আপনারে কাম সন্তান ভেবে মার সতীত্বে করে কটাক্ষ/ যীশু ব্যাসদেব কুন্তীপুত্র দিতেছে কাদের কথার সাক্ষ্য ৯২) যত নিষ্ঠুরই হোক, তা ব্যঙ্গমাত্র। গঠনমূলক সমালোচনা নয়।

বারাঙ্গনা কবিতার মূল ত্রুটি এখানে নয়। বারাঙ্গনা কবিতার ত্রুটি কবিতাটির ভাবের অপূর্ণতায়। বরং বলা ভালো সমাজ সচেতনতার অভাব বারাঙ্গনা কবিতাটিকে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পতিতা চরিত্র নিয়ে এদেশের শরৎচন্দ্র কিংবা ফ্রান্সের গী দ্য মঁ পাঁসা যে সমাজ চৈতন্যের পরিচয় রেখেছেন, নজরুল আশ্চর্যভাবে তা এড়িয়ে গেছেন। অভাবের তাড়না, সমাজের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ নারীই যে লক্ষ কামনার বলি হচ্ছে এ কথাটিই না বলে নজরুল কামনারই জয়গান করে বলেছেন পরোক্ষে। এবং যে বারাঙ্গনা কামনাময়ী ভোগ্য ছাড়া কিছুই নয় (এই ছবিই নজরুল এনেছেন তাঁর কবিতায় মূলত) তাকেই মাতৃ সম্বোধনে মহৎ করে তুলতে চেয়েছেন। এইখানেই রচনাটির অসংগতি। মোহিতলালের চোখে এটাই ধরা পড়েছিল যদিও ব্যক্তিগত বিরাগে সমালোচ-নাকে তিনি কিছুটা উত্তপ্ত করে তুলেছেন এবং অসহ্যও।

(৬) 'নারী' কবিতায় নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি, কবিতাটির ভাব এবং আঙ্গিকগত সৌন্দর্য অব্যাহত রেখেই।

নারী ছাড়া পুরুষের জীবনের, এমনকি সৃষ্টিতত্ত্বের অপূর্ণতার ইশারা দিয়েছেন কবি, তাত্ত্বিক নয় একান্ত জীবনলিপ্সু দৃষ্টিতে।

নর দিল ক্ষুধা নারী দিল সুধা ক্ষুধায় সুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহা মানবের মহাশিশু পলে পলে।৯৩

নারীর রোম্যান্টিক দিক যেমন সত্য তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীকে মূল্য দেবার চেষ্টা হয়নি। কবি স্পষ্ট উল্লেখ করেন :

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।৯৪

জন্মদাত্রী, শান্তিদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী নারীকে আমরা বন্দিনী করে রেখেছি কঙ্কন অলংকারের শৃংখলে, পর্দার অবরোধে। নজরুল নারী জাগরনী শোনালেন :

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল,
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ।৯৫

সমাজে বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে নারীদের বন্দী দশায় থেকে উদ্ধারের জন্য নজরুল বিভিন্ন ভাষণে বক্তব্য রেখেছেন। তৎকালের মুসলমান সমাজের নারী প্রগতির অগ্রবর্তিনী মিসেস এম. রহমানকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েও নজরুল অনুরূপ ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন।৯৬

রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' (মহুয়া) কিংবা 'স্ত্রীর পত্র' (গল্পগুচ্ছ)-র মধ্যে যে নারী জাগরণের প্রকাশ আছে নজরুলের নারী স্বাতন্ত্র্যের চিন্তা তার স্বগোত্রীয়।

সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে রোম্যান্টিক জীবনবাদীতার দিক থেকে বোধ করি 'পাপ' কবিতাটি শ্রেষ্ঠ এবং সমাজ চৈতন্যের কবিতা হিসেবে 'কুলি-মজুর'। ছন্দস্পন্দে কবিতাগুলি দীর্ঘমাত্রাবৃত্ত রীতির।

কুলি, মজুর, চাষীর কথা বলবার মহৎ দায়িত্ব কবি তুলে নিয়েছেন। কেননা কবির ভেতর দিয়েই তাদের আত্মা বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চায়, এমন দাবী নজরুলের :

ওরা তো বলেনা তুমি কেন বল, কেন তব মাথাব্যথা।
জিজ্ঞাসে সাধু, আমি বলি কহে ওদেরি আত্মকথা।"৯৭

আর এই গভীর মানবতার সূত্রেই তাঁর মনে পুঞ্জিত হচ্ছিল সুতীব্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহ-প্রচলিত রাজশক্তি, সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অসম পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। আমার কৈফিয়ৎ-এ তাই তাঁর এই তিক্ত ক্ষিপ্ততার হেতু নির্ণয় করে বলেন :

"বন্ধুগো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে।"৯৮

নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে ব্যথিত হয়েছেন নজরুল। যে রাজশক্তি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতির প্রতি ব্যক্তিগত আস্থা ছিল না তাঁর; মূলত যে তিনি নৈরাজ্যবাদী সেই তাঁকেও দুঃখজনকভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল রাজনীতিতে। ভোটযুদ্ধে নামতে গিয়েছিলেন তিনি। ভুল হয়েছিল। ভুল হয়েছিল সে সিদ্ধান্ত। এবং কে জানে এজন্য তাঁকে গভীরতর মাশুল দিতে হয়েছিল কিনা। কাব্য নয় শুধু ব্যক্তিজীবনেও! পরবর্তী অধ্যায়—"নজরুল ইসলাম : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব"-এ আমরা তার পরিচয় নিতে চেষ্টা করব।

তথ্যপঞ্জী

১। শম্ভু রায়ের পত্র : প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে / কাজী নজরুল / প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / পরিশিষ্ট অংশ / এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং।

২। ক. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / আমার বন্ধু নজরুল / লেখক কর্তৃক প্রকাশিত,।

খ. মুজফ্‌ফর আহম্মদ / নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা / ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী।

৩। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্য সমীক্ষা / মুক্তধারা, ভারতীয়।

৪। রবীন্দ্রনাথ / নৈবেদ্য।

৫। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / নজরুল চরিত মানস / ভারতী লাইব্রেরী।

৬। আব্দুল আজীজ আল আমান / নজরুল পরিক্রমা।

৭। রবীন্দ্রনাথ / এবার ফিরাও মোরে / চিত্রা / বিশ্বভারতী।

৮। নজরুল / বিদ্রোহী / সঞ্চিতা।

৯। মধুসূদন বসু / নজরুল কাব্য পরিচয় / শশাঙ্কজীবন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

১০। সাম্যবাদী (মানুষ) / সঞ্চিতা / ডি. এম. লাইব্রেরী।

১১। ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত / কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় / এ. মুখার্জী।

১২। কাজী আব্দুল ওদুদ / 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধ / মূলগ্রন্থ : কবি নজরুল / সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৫৭ / পৃ. ২৩।

১৩। ব্যথা গরব / দোলন চাঁপা, নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / হরফ / পৃঃ ১৯।

১৪। মধুসূদন বসু / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৫-৫৬।

১৫। মধুসূদন বসু / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৯।

১৬। যদি আর বাঁশী না বাজে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত/ পৃঃ ৪০১।

১৭। ড. সুশীল কুমার গুপ্ত / নজরুল চরিতমানস / ভারতী লাইব্রেরী / পৃঃ ১৬৭।

১৮। ঝড় / নজরুল রচনাসম্ভার, ৩য় খণ্ড / পুর্বোক্ত / পৃঃ ১৬।

১৯। বুদ্ধদেব বসু / কালের পুতুল / নিউ এজ, ১৯৫৯ / পৃঃ ১২৫।

২০। কেশব চৌধুরী / ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্যদ, ১৯৫৯ / পৃঃ ২৯৮।

২১। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ / ভূমিকা, ইকবালের নির্বাচিত কবিতা / ফররুখ আহম্মদ / ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৫৯ / পৃঃ ৩।

২২। নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৮১।

২৩। ডঃ মজহারুল ইসলাম / সাহিত্যপথে / মূলগ্রন্থ : নজরুল কাব্য সমীক্ষা / আতাউর রহমান / মুক্তধারা, ভারতীয় সং ১৯৫৯ / পৃঃ ১৪২।

২৪। 'আসরারে খুদি' ফার্সিগ্রন্থের উর্দু অনুবাদ—'আসরারে ইকবাল' / হুসেন মেহেদী রিসবী। আসিন বিহারী পাবলিকেসনস, মুরাদাবাদ, ১৯৪২ অবলম্বনে।

২৫। মুজফফর আহম্মদ / স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৪২-২৪৫।

২৬। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্যসমীক্ষা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪২।

২৭। তিনি (ইকবাল) হিন্দু বা হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, '......অন্যান্য সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আইন, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে।'— কেশব চৌধুরী / ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ / পূর্বোক্ত/ পৃঃ / ৩৫৩।

২৮। আসরারে খুদি/অনুবাদ : ফররুখ আহম্মদ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৫৭-৫৮।

২৯। ঝড় / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৬।

৩০। বিদ্রোহী / সঞ্চিতা / ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৪২ / পৃঃ ৩।

৩১। বিদ্রোহী / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩-৪।

৩২। আসরারে খুদী / অনুবাদ : ফররুখ আহম্মদ / ইকবালের নির্বাচিত কবিতা / পূর্বোক্ত পৃঃ ৫১-৫৩।

৩৩। আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে / সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭।

৩৪। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / নজরুল চরিত মানস / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

৩৫। অনুঃ কেশব চৌধুরী / পূর্বোক্ত গ্রন্থ / পৃঃ ২৯৮।

৩৬। সাবধানী ঘণ্টা / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪২।

৩৭। চির নির্ভয় / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৭।

৩৮। আনন্দময়ীর আগমনে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৪৮।

৩৯। তদেব।

৪০। ফরিয়াদ / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮৪-৮৬।

৪১। শেকোয়া / অনুঃ ফররুখ আহম্মদ / পূর্বোক্ত /পৃঃ ৩৯।

৪২। আবু সয়ীদ আয়ুব / গালিবের গজল থেকে / দেজ, ১৯৪২/ পৃঃ ২২।

৪৩। সৈয়দ আলী আহসান / 'ইকবালের কবিতা' / প্যারাডাইজ লাইব্রেরী ১৯৫২, ভূমিকা / মূলগ্রন্থঃ ইকবালের নির্বাচিত কবিতা / পূর্বোক্ত ভূমিকা অংশে উদ্ধৃত / পৃঃ ৫।

৪৪। সাম্যবাদী / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৬৯।

৪৫। বিদ্রোহী / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩।

৪৬। নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড / হরফ, ১৩৫২ / পৃঃ ৪৮৮।

৪৭। মোবারক বাদ / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য়/হরফ / পূর্বোক্ত পৃঃ/১৪৮।

৪৮। কেশব চৌধুরী / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩০১।

৪৯। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় / আধুনিক বাংলা কবিতা ও দ্বন্দ্ববাদ / বিশ্ববিজ্ঞান ২য় সং / পৃঃ ৩০।

৫০। ফরমান-ই-খুদা / অনুঃ ফররুখ আহম্মদ / পূবোক্ত, পৃঃ ৬।

৫১। দরিদ্র মোর পরমাত্মীয় / নজরুল রচনাসম্ভার, ৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ/২৫৬।

৫২। আজীজ আল আমান / নজরুল রচনাসম্ভার, ২য় / হরফ / ১৯৫২ / পৃঃ ৬৮৪ (পুস্তক পরিচিতি ঃ মৃত্যু ক্ষুধা উপন্যাস প্রসঙ্গে)

৫৩। মুজফফর আহম্মদ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৮৯।

৫৪। দারিদ্র্য / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১।

৫৫। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২১০।

৫৬। 'সাহিত্যের নবত্ব'/রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড, জ. শ. বা. সং ১৩৩৫ / পশ্চিমবঙ্গ সরকার / পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫।

৫৭। 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড/পূর্বোক্ত/ পৃঃ ৩৪৪।

৫৮। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৬৯।

৫৯। তদেব।

৬০। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২১০।

৬১। দারিদ্র্য / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১।

৬২। দারিদ্র্য / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৩৯।

৬৩। দারিদ্র্য / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১।

৬৪। তদেব।

৬৫। বিদায় অভিশাপ / সঞ্চয়িতা / বিশ্বভারতী / পৃঃ ২০২-২০৩।

৬৬। নজরুল রচনা সম্ভার ১ম / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৮৫।

৬৭। 'ওঠরে চাষী' / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪৮।

৬৮। নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম / হরফ, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৮৭।

৬৯। 'শ্রমিক মজুর' / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৮।

৭০। শ্রমিক মজুর / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৯।

৭১। গোপালচন্দ্র রায় / 'রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ' প্রবন্ধ / দেশ, শারদীয়, ১৩৩৫।

৭২। মুজফফর আহম্মদ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫।

৭৩। আনোয়ার হোসেন-কে লিখিত পত্র/নজরুল কাব্য সমীক্ষা/আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত থেকে উৎকলিত / পৃঃ ৩৫।

৭৪। কুলি মজুর / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮২।

৭৫। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৮।

৭৬। কুলি মজুর / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮২।

৭৭। তদেব।

৭৮। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১২২।

৭৯। JOHN A. SUBHAN / Sufi Saints and Shrines in India / New York, 1919 / p. 21.

৮০। Ibid / p. 18-19.

৮১। Ibid / p. 284.

৮২। Ibid / p. 22.

৮৩। Ibid / p. 33.

৮৪। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / কাজী নজরুল / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪৯।

৮৫। মানুষ / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭২।

৮৬। মানুষ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৩।

৮৭। মানুষ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭২।

৮৮। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম / অনুঃ নজরুল ইসলাম / মোহন লাইব্রেরী ১৯৪৯ সং / রুবাঈ সংখ্যা-১২৩।

৮৯। পাপ / সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৫-৭৬।

৯০। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১১৩।

৯১। নজরুল কাব্য সমীক্ষা / আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

৯২। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ১১৩।

৯৩। নারী / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৯।

৯৪। তদেব।

৯৫। নারী / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮১।

৯৬। মিসেস এম. রহমান / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৭৮-১৮২।

৯৭। ভুল ও ফুল / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৭৩।

৯৮। আমার কৈফিয়ৎ / সঞ্চিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৯১।

নজরুল ইসলাম : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম রাজনীতিমনস্ক কবি। এ রাজনীতি মূলতঃ ছিল পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। এই স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল :

* দেশের সর্বসাধারণকে তাদের পরাধীন অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানোর দায়িত্ব।

* দেশের সর্বহারাদের জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংঘাতের স্বরূপ উপলব্ধি প্রণোদনা।

* হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আন্তরিক প্রয়াস।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল প্রতিভার প্রারম্ভিক (১৯২০।২১) কালটা ছিল যথেষ্ট জটিল ও পরস্পরবিরুদ্ধ সব রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মুখর। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের (সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার) একটি অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। সরকারী নিষ্পেষণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ স্তব্ধপ্রায়। "দেশের কর্মীরা ফাঁসিতে, পুলিশের গুলিতে মরেছে। শত শত বন্দী জেলে পচে মরেছে। দেশের জনগণের লাঞ্ছনা, দুর্গতি, অসাফল্য ও জীবনের মর্মবেদনা যেমন ছিল তেমনি আছে।[১]"

"তাই এক অধীর উন্মুখ ও প্রতীক্ষা কাতরচিত্তে যুগ যেন তার চারণ কবির প্রতীক্ষা করছিল, সেই প্রতীক্ষা ও চাহিদার ফল : নজরুল ইসলাম। মুহূর্তে তাঁর জন্যে সমস্ত যুগ বাণীময় হয়ে উঠল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুসলিম দেশগুলির নবজাগরণ শোষিত শ্রেণীর জয়যাত্রা, মানবতার নবচেতনা ও বেঁচে থাকার লড়াই-এ সবেরই তিনি বাণীমূর্তি।...

পরাধীনতা ও পরবশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মতো এদেশের আর কোন কবিই সংগ্রাম করেননি; এমন ব্যাপক বিদ্রোহের বাণী-প্রচার করেননি কেউই।[২]"

ছাত্রজীবনে শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাবে নজরুল কিছুটা অগ্নিমন্ত্রের উত্তাপও পেয়েছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নজরুল সে সময়ে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পাননি। তার কারণ সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোয় নজরুল নিতান্তই বালক।

কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণ পরোক্ষে তাঁর মানস গঠনে একটা ছাপ ফেলছিল এটা আশা করা যেতে পারে। ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে চলে গেলেন নজরুল। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে জাতীয় জীবনের আলোড়ন ছাড়াও দুটো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ঘটেছিল—

১) রাশিয়ায় গণবিপ্লব; ২) দক্ষিণ-পশ্চিম-এশিয়ায় তুরস্কের অভ্যুত্থান। দুটো বিষয় নিয়েই নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। একটি 'ব্যথার দান' অন্যটি 'কামাল পাশা'। প্রথমটি সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে, দ্বিতীয়টি চাকরী শেষে ফিরে, কোলকাতায় থাকাকালে।

'ব্যথার দান' গল্পটির ওপর রুশ বিপ্লবের কথা মুজফফ্‌র আহম্মদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে।৩

এদুটি ঘটনা ছাড়া তাঁর আবাল্যের দৈন্যদারিদ্র্য-এবং ব্যক্তিজীবনের প্রেম-প্রহত মানসিকতা তাঁকে রাজনীতির প্রতি পরোক্ষে এগিয়ে দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুজফফ্‌র আহম্মদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়া ও কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনায় ও তাঁর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ স্পষ্ট।৪

এই সময়ে (১৯২০।২১) বাংলার মুসলমান শিক্ষিত যুবকেরা বাম রাজনীতি বা রুশ বিপ্লবের দ্বারা বেশী মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে গ্রহণীয় হতে পারে:

'ভারতীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক আমলে শুধুমাত্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই প্রগতিশীল, আধুনিক জীবনের সূত্রগুলির সন্ধান করেছিল এমন নয়। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কর্মের জগতে ঐ সমাজ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদী আদর্শ রূপায়ণে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তুর্কী অথবা আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঐ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তার দিগন্তকে নূতন আলোর সন্ধান দেয়। ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান যুবক ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রেরণা লাভ করেন। ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব সমকালীন ভারতে প্রধানত সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত ছিল। মুসলমান যুবশক্তির একাংশ এরূপ আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। মুসলমান যুবকেরা জাতীয়তাবাদ ও

শ্রেনীচেতনার শিক্ষা এরূপ আন্দোলন থেকে লাভ করেন। ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো, শ্রেণীসম্পর্ক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অভিজ্ঞতা লাভ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ স্বদেশে ও বিদেশে কর্তব্যরত থেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করতে থাকে।"৫

নজরুলের মানসিকতায়ও এই পরিবেশের প্রভাব পড়তে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা বিষয়ও ভাবতে হয়। ভারত তথা বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ছিল সেই দলে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্থান ছিল না।

"মুসলমানদের দলে নেওয়া সম্বন্ধে কারুর কোনো উৎসাহ ছিল না এবং একটা অবিশ্বাসের ভাবই বিদ্যমান ছিল।"৬

'কুহেলিকা' (১৯৩১) উপন্যাসেও নজরুল এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। এতএব একথা স্পষ্ট যে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা থাকলেও নজরুলের পক্ষে প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু "বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈপ্লবিক আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়, তার পেছনে তাঁর লেখনীর প্রেরণা—অনস্বীকার্য।৭"

আরো মনে হয়, সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা এবং অহিংস সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা—অর্থাৎ তাঁর সমকালের রাজনীতির সার্বিক নিষ্ফলতা তাঁকে রাজনীতির নতুন কোন platform খুঁজতে উৎসাহী করেছিল [১৯২০তে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সম্মিলিতভাবে দেশে একটা আলোড়ন তুলেছিল। ১৯২১-এ গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে বিভিন্ন পেশাদারী মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেন। দেশের জনতা ট্যাকস বন্ধ আন্দোলনের দাবী জানান। কংগ্রেস 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের' জন্য এক কোটি টাকা তোলার, এক কোটি সভ্য সংগ্রহ করার ও কুড়ি লক্ষ চরকা তৈরীর ডাক দিলেন। এরপর গান্ধিজীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে ৩০ হাজার সত্যাগ্রহী জেলে যান। ঘটনাক্রমে চৌরীচৌরার হিংস্রতা (জনতাকর্তৃক থানা আক্রমণ ও কয়েকজন পুলিশকর্মীকে জীবন্ত দগ্ধ করা)-র প্রতিবাদে গান্ধিজী 'আইন অমান্য' বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে সারা দেশব্যাপী একটা হতাশা ও শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়।৮ এই রাজনীতির নাটক সম্বন্ধে নজরুলের বিদ্রূপ আছে পরবর্তীকালের কবিতায়: 'এলো কোটি টাকা এলো না স্বরাজ'৯]। কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনাও এই Platform খোঁজারই ফলশ্রুতি।

স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও তিনি করেছেন। কিংবা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তে তাঁর সচেতন উক্তি মনে পড়ে :

"আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্য ঘরের বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।"[১৭] মোট কথা নজরুলকে তাঁর সমকাল বুঝতে পারেনি—এটা নজরুল বুঝেছিলেন গভীরভাবে। আর তাই তিনি খুলে দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ের সব আগল। যে কোনো সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে তিনি দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়েছিলেন। "কবি নজরুল বুঝতেন যে, 'কবি কোনো দলের নয়—কবি হল শতদলের।' এর থেকে বোঝা যায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তি যে কোন দলই আনুক না কেন কবি তো গাইবে দলের জন্য নয়, শতদলের অর্থাৎ যে কোনো মানুষের মুক্তির জন্যে।"[১৮] বস্তুতই নজরুলের রাজনৈতিক মানস গঠনের ভিত্তিমূলে যত কিছুরই প্রভাব থাক, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতবাদ, তাঁর স্বকীয় চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত।"[১৯] এবং বলতে আপত্তি নেই তা মহত্তর মানব কল্যাণের এক ইউটোপীয় ধারণা।

ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সহিংস ও অহিংসপথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল, কাব্য, সাহিত্য, গান ও ভাষণের মধ্য দিয়ে নজরুল তাতে আর এক মাত্রা যোগ করে দিয়েছিলেন। স্থূল অর্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করলেও নজরুলের রাজনৈতিক বক্তব্য সমকালীনতায় ও স্বার্থপরতায় আবদ্ধ ছিল না। যে কোনো প্রকার শাসন ও শোষণ থেকে মানুষের চিরবন্ধন মুক্ত আত্মার মুক্তিবাসনায় তিনি ছিলেন আন্তরিক চেষ্টিত। 'তাঁর চেতনা সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাকে অতিক্রম করে গেছে'[২০] বলেছেন সমালোচক।

'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে (১৯২০/১২ জুলাই) নজরুলকে এই বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাবনা প্রচার করতে দেখি। এ ক্ষেত্রে তিনি মহান

মনুষ্যত্বের মুক্তির বাণীবাহক রুশো-পেইন-গডউইন, মার্কস, প্রধঁ প্রমুখ চিন্তা-নায়কদের মতো মনুষ্যত্বেরই সমর্থক। রুশো, পেইন দাবী করেছেন আর্থিক সমতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রসত্তার অবসান। রুশোর মতো নজরুলের ভাবনায়ও মানুষের মুক্ত স্বাধীন সত্তার স্বরূপ অভিনন্দিত বারবার। "মানুষ প্রথমে জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে চঞ্চলতা চিরমুক্ত, সে সরলতা অবাধ-গতি, সে সরলতা উন্মুক্ত উদার। মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডী, সমাজের সংকীর্ণতা, জাতির দেশের ভ্রান্ত গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছপ্রাণ এইসব বেড়ির বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে।"২১

এই বিশুদ্ধ মানবমুক্তির পক্ষপাতী নজরুল নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন নৈরাজ্যবাদী। আর এই নৈরাজ্যবাদের সমর্থক বলে তিনি চেয়েছেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে। দেখতে চেয়েছিলেন মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ :

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না কেন না ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করিয়া থাকেন। (তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ : তাহলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় স্বরাজ জিনিসটা কি। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেননি। 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধ / কালান্তর) ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়র হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।"২২ এই স্বাধীনতার দাবীর মধ্যে রূপ ছিল, শক্তির তেজ ছিল। ছিল না অনুনয় প্রার্থনা নিবেদনের ভাব। ফলে এতদিনকার খিতিয়ে পড়া সন্ত্রাসবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। প্রাক্তন বিপ্লবীরা সমর্থন করতে লাগলেন পত্রিকাকে।

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় অহিংস আন্দোলন ও আন্দোলকদের গালি দিয়ে বসলেন নজরুল : "মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসাবোল নাকি নাকি / খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি / হান তরবার আন মা সমর অমর হবার মন্ত্র শেখা / মাদীগুলায় কর মা পুরুষ রক্ত দে মা রক্ত দেখা।"২৩

'ধূমকেতু'র চমকে অর্ধচেতন জাগলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণে

১ বছর কারাগারে অন্তরীণ থাকতে হল নজরুলকে। ১৯২৩, জানুয়ারীর ১৬ থেকে ডিসেম্বর ১৫, ১৯২৩ অবধি। একাধিক গ্রন্থ নিষিদ্ধ হল নজরুলের। 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হল ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর। শিশির কর তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে বইটি সম্বন্ধে সরকারী ফাইলের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন: 'On the whole it is a dangerous book, forceful and vindictive". [Sd-/ Illegible, date: 16. 1. 41. File No. 58-31/40 Home (Pol)] ২৪ ১৯২৪ সালে নিষিদ্ধ হল 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'।

'প্রবাসী' বিষের বাঁশী সম্বন্ধে লিখলো, "কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ে প্রচণ্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।" ২৫ 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস লিখলেন, "স্বদেশী আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক, তাঁহারা ঠিক সেভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; পরবর্তী আন্দোলনের চারণ কবি তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে।" ২৬

সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়ে বারে বারে নজরুলকে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনা ও প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। ধারাবাহিক ভাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর একাধিক গ্রন্থ। নিষিদ্ধের সুপারিশ হয়েছে অথচ নিষিদ্ধ হয়নি এমন গ্রন্থও কম নয়—'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (?)। নিষিদ্ধ বইপত্রের মধ্যে আছে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' ছাড়া 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) এবং 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১)। প্রলয়শিখার জন্যও নজরুলকে (১৯৩০ ; ডিসেম্বর ১৭) চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কবির ৬ মাস জেল দেন। কবিকে আপীল করতে হয়। এই সময় গান্ধী-আরউইন চুক্তি [যে সকল দেশসেবক কারাগারে আবদ্ধ (তৎকালে) এবং যাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক মামলা তখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি তাদের সকলকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে—এই ছিল চুক্তির মূল দাবী।]-র ফলে কবি মুক্ত হন। ২৭ শাস্তি কার্যকর হয়নি।

১৯২৩ থেকে ১৯৩১ সরকারী পক্ষের জ্বালাতন কবিকে সহ্য করতে হয়েছে। যদিও ১৯২৯-এর পর থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গানের জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন তবু রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁর সক্রিয় ছিল সংজ্ঞাহীন হবার আগে পর্যন্তই। সমাজ ও রাজনীতিগত ভুল-ত্রুটির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হানছেন তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোক বুকে নিয়েও। 'চন্দ্রবিন্দু' তাঁর এই মানসিকতার প্রমাণ।

প্রশ্ন, কি তিনি চেয়েছিলেন, এই উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে? কোন্ স্বার্থ তাঁকে এমনভাবে কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছিল? বিভিন্ন ভাষণ ও নিবন্ধে নজরুলের এই প্রত্যাশার রূপ, এই মানবতাবাদী মানুষটির স্পষ্ট কথা শুনতে পাওয়া যায়।

নজরুল চেয়েছিলেন, আমরা আগেই বলেছি, এক শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজ। এই প্রত্যাশার আত্মিক প্রণোদনায় নজরুল 'The labour Swaraj Party of the Indian National Congress' গড়ায় চারজন উদ্যোক্তার একজন হয়ে পড়েন ১৯২৫-এর নভেম্বরের দিকে। ডিসেম্বর ২৫শে ঐ দলের মুখপত্র 'লাঙ্গল' প্রকাশ করেন। সম্পাদক নয়, ঐ পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন তিনি। 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় 'পলিটিকাল তুবড়ী বাজি' নিবন্ধ। বড়দিনের ছুটীতে কানপুরে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনের পরে। সেই নিবন্ধে নজরুলের রাজনীতিসচেতন মনের স্বরূপ সুস্পষ্ট। আমরা নিবন্ধটির নির্বাচিত কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে চাই:

* 'কৃষক শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকশান-এ আবার দলবেঁধে কাউন্সিলে প্রবেশ করা। কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি। আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি?

* 'আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি'।

* 'আজ এই শবসাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে……নেতাদের স্তোকবাক্যে ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যাঁরা নিজেদের উঁচু দেখান; সিন্ধবাদের নাবিকের সেই বোঝা ফেলে দাও। ২৮

'লাঙল' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (পৌষ ১, ১৩৩২) লিখছেন :

* আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি, আবার বলছি স্বরাজ-পেলে এই সমস্ত সমস্যা আপনিই দূর হবে।

এই স্বরাজটা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছি কি?" ২৯

এই রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নজরুল জনগণের সেবায় উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। সরে আসছিলেন তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মুখে আর কাজের গভীর দূরত্বের ঘৃণ্য রূপ দেখে। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিবাদে স্বাধীনতার সংগ্রাম জোরদার হবে এটা মনে-প্রাণে মানতেন নজরুল। কিন্তু ঐ সময়ে নেতাদের আচরণ আর ভাষণের মধ্যে যে হাস্যকর গরমিল ছিল তা বুঝেছিলেন তিনি স্পষ্টভাবে। তাই 'ছুঁৎমার্গ' নিবন্ধে লেখেন :

"হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যায় যে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন, মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,—মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা। হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা? অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া একটি অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়।" ৩০

নিবন্ধটির উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সংস্কারাবদ্ধ আচরণ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গণ আন্দোলনের কতখানি বিরুদ্ধে ছিল। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধের এই দিকটার সাথে জাতীয় আন্দোলনে মৈত্রীর বুলি আওড়ানোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার রূপ। স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই অভিজ্ঞতা : হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। ৩১

বাঙালী সমাজ ব্যবস্থার এই সত্য রূপ নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দেখেছেন, প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেই চুপ করে গেছেন ঋষিদ্রষ্টার মতো। আর নজরুল এই অসামঞ্জস্য দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিল কর্মীর অধ্যবসায়ে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ই বিরূপ হয়ে পড়েছিল তাঁর প্রতি। এটাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ট্রাজেডি।

১৯২৪-এ গান্ধিজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে যেমন দেশোদ্ধার ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন, তেমনি দেখা যাচ্ছে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে যুক্ত থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন নজরুল। আবার মধ্যবিত্ত স্বার্থ ছেড়ে মুজফ্ফর আহম্মদ যখন তাঁকে খোলা চিঠিতে (দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে) ধূমকেতু অক্টোবর ১৩, ১৯২২-এ লেখেন কৃষক মজুরদের প্রসঙ্গে লিখতে ও ভাবতে ৩২ তখন থেকেই তাঁর রচনায় কৃষক-মজুরদের কথা ধ্বনিত হয়।

মুজফ্ফর আহম্মদ সাহেব মন্তব্য করেছেন, "১৯২২ সালের ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের ধারণা ছিল যে, দেশের মুক্তি তাঁরাই আনতে পারবেন, আর মজুর ও কৃষকেরা গড্ডালিকা প্রবাহের মত তাঁদের অনুসরণ করবেন। যাঁরা রাজনীতি করতেন না তাঁরা তো মজুর কৃষকদের নাম শুনলেই নাক সিঁটকাতেন। আজ অভিজ্ঞতার বিপুল পরিবর্তন এসেছে। ভদ্রলোকেরা এখন মজুরে পরিণত হচ্ছেন। নজরুল ইসলামের চেতনায়ও পরিবর্তন এসেছিল। ১৯২২ সালের পরে মজুর, কৃষক ও জনগণকে বাদ দিয়ে নজরুলকে কল্পনাই করা যেতো না।৩৩"

মনে হয়, শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহম্মদ সাহেবের দাবী একটু বেশী মাত্রায় নজরুল ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেন না, নজরুলের ব্যক্তিজীবনের পটভূমি যে দারিদ্র্যের। যে নজরুল রুটির দোকানের ছোকরা, গার্ড সাহেবের বাবুর্চির অভিজ্ঞতায় গঠিত, তাঁর রচনায় কৃষক, কুলি ও মজুরদের কথা কেবল মুজফ্ফর সাহেবের নির্দেশে এসেছে। এটা বিশ্বাস করার অর্থ নজরুলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অসম্মান করা।

নজরুলের সমকালের উল্লেখ্য পত্রিকা 'কল্লোল' যদিও রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল না এবং নজরুলের রোমান্টিক কবিতাগুলির প্রকাশ মূলত কল্লোলেই, তবু কল্লোলে যে বামপন্থী লেখালেখি হচ্ছিল এবং প্রেমেন্দ্র, শৈলজা ও যুবনাশ্বের রচনায় যে মজুর কুলি ও শ্রমিকদের কথা লেখা হচ্ছিল, যে দারিদ্র্যের কথা:

প্রকাশ পাচ্ছিল—সেগুলোর পেছনে তো নিশ্চয়ই মুজফফ্‌র সাহেবের নির্দেশ ছিল না। অতএব একথা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে নজরুল কারোর নির্দেশনামার চাইতে পরিচালিত হয়েছেন যুগ-প্রভাবের দ্বারা এবং তাঁর অন্তর্গত প্রবণতায়। কল্লোলীয় বোহেমিয়ান নৈরাজ্যবাদ নজরুলেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এবং মনুষ্যত্বের প্রতি যে সম্মানবোধ কল্লোলের লেখালেখির একটি বৈশিষ্ট্য৩৪ যুগ প্রভাব হিসেবে নজরুলেও তা লক্ষ্যগোচর।

১৯২৬ সাল নজরুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অন্তত তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতি জীবনের ক্ষেত্রে। ১৯২৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের ২য় অধিবেশন। নজরুল জানুয়ারীতে কৃষ্ণনগরে বাসা নিয়ে এসেছেন। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী হেমন্তকুমার সরকার নজরুলের বন্ধু। এ-সভার ব্যবস্থাপনায় নজরুল ছিলেন। ঐ বছর মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল। নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন ছাড়া, কথা ছিল বঙ্গীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হবে। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন হতে যাচ্ছিল। নজরুল রীতিমত ব্যস্ত ছিলেন এই সব নিয়ে। ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা থেকে শুরু করে আনুসঙ্গিক আরো অনেক কিছুই তাঁকে করতে হচ্ছিল।

এরই মধ্যে (এপ্রিল ১৯২৬) শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার ভয়াবহতা ও বীভৎসতা আমূল আলোড়িত করেছিল নজরুলকে। ঐ সময়ে নজরুল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য।৩৫ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে নজরুল রচনা করলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।' গাইলেনও। গানটির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দেশবাসীকে এবং দেশনেতাকে সাবধান হতে বলেছেন। স্মরণ করেছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বীর শহীদদের। আশা প্রকাশ করেছেন, আমাদের রক্তে রঙীন সূর্য উঠবে স্বাধীনতার, যা পলাশীর যুদ্ধে ডুবে গেছে। জাতীয়তাবাদী ভাবনার দিক থেকে গানটি অনবদ্য বলেছেন নারায়ণ চৌধুরী।৩৬ আর এই গানের গভীর আবেদনকে তীব্র ব্যঙ্গ করে ঐ সভায় চিত্তরঞ্জন কৃত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট-কে নাকচ করা হয়। নেতাদের তীব্র মতান্তর ও মনান্তর ঘটে। বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন নজরুল পরবর্তীকালে এই ব্যাপারকে অবলম্বন করে—'বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই।'৩৭ ঐ সময়ে ছাত্র সম্মেলনের উৎসবে উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল, সুপরিচিত 'ছাত্রদলের গান,'

আর যুব সম্মেলনে গীত হয় 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল' গানটি। গীত হলেও গানটি সম্ভবত এর আগে রচিত, ঐ সময়ে নয়।৩৮

১৯২৬ সালে নজরুল ঢাকা বিভাগের কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য পদের প্রার্থী হয়ে ভোট যুদ্ধে নামলেন বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদের নিষেধ অমান্য করে। এবং নিজেকে কিছু দেনায় জড়িয়ে জামানত হারিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসেন। শেখ দরবার আলম অনুমান করেন প্রকাশকদের কাছ থেকে বই বিক্রির টাকা নিয়ে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।৩৯

কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ও প্রতিশ্রুতিতে নেমেছিলেন নজরুল এই ভোট যুদ্ধে। কিন্তু অবশেষে হারতে হল তাঁকে।৪০ বিপুল জনপ্রিয়তা, জনগণের প্রতি গভীর, আবেগময় শুভাকাঙ্ক্ষা যে ভোটযুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়, নজরুলের এ শিক্ষা দরকার ছিল। রাজনীতির গলি-ঘুঁজি এবং রাজনীতি সচেতন আদর্শ-বাদ—এ দুয়ের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান এটা নজরুল বুঝেছিলেন নিশ্চয়ই এই গ্লানিকর পরাজয়ে।

নজরুল সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ চিনেছেন। নিজে তা হতে পারেননি বলে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যও করেছেন :

বক্তৃতা দিয়ে কাঁদিতে সভায়,
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা, এইবেলা ঢোকা, সেই তালে,
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষ কালে।

আমার কৈফিয়ৎ / সঞ্চিতা

নজরুল পস্তাতে রাজী ছিলেন সজ্ঞানে। আখের গোছাতে চাননি। আর তাই নির্দিষ্ট কোন দলের আওতায় বাঁধতে না পেরে তাঁর প্রতি বোধ করি আস্থা হারিয়েছিলেন সব দলের, সংগঠনেরই লোকজন। বস্তুত নজরুল নির্বিচারে এবং নিরপেক্ষ সহৃদয়তায় সমস্ত দলনেতা ও রাজনীতি কর্মীর প্রতি ছিলেন নিবিষ্ট মনোযোগী।

গান্ধিজীর উদ্দেশ্যে গান ও কবিতা লিখেছেন যেমন তেমনি 'চীন ভারতের জয় হোক' গাইছেন চিয়াং কাইশেকের আগমনে। মোতিলাল নেহেরুকে সমালোচনা করলেও সমর্থন করেছেন শিঙ্গরভেলুকে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙালীর হয়ে তর্পণ করেন যেমন, তেমনি মাদারিপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের মুক্তিতে আনন্দ অভিনন্দন জানান। চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার দত্ত—প্রত্যেকের জন্য ছিল তাঁর গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

"অনুশীলন, যুগান্তর-শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্লবীদল; স্বরাজ্য পার্টি, খিলাফত, কংগ্রেস দক্ষিণ ও বামপন্থীদল, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি যারা যখনই কবিকে চেয়েছে, কবি তখনই তাঁর রচনা দিয়ে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈনিক হতে— শহীদ হতে আহ্বান জানিয়েছেন।"৪১

এর পরিণাম হয়েছিল নজরুলের ব্যক্তিজীবনের পক্ষে মারাত্মক। প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নজরুলের প্রতি বিরূপ ও উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতা ও দারিদ্র্যের দিনগুলোয় তেমন করে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলকে তেমন উৎসাহী সাহায্যকারী হিসেবে দেখা যায়নি। যেহেতু নজরুল কোনো এক বিশেষ রাজনীতির দলভুক্ত লোকের সাহায্যপুষ্ট এই অজুহাতে তাঁর এতদিনকার বন্ধু মুজফফ্‌র আহম্মদও নজরুলের সংস্পর্শ এড়িয়ে গেছেন,৪২ এটা যেমন লজ্জার তেমনি অনুশোচনারও বটে। নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় গ্রন্থে জুলফিকার সাহেব যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন যদি তার কিয়দংশও সত্য হয় তা হলে আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা নেই। যে মানুষটিকে সমস্ত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, নিজেদের স্বার্থে, প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে তাঁর অসহায়তায় সবাই আশ্চর্যরকম উদাসীন হয়ে পড়লেন, সেহেতু নজরুল ছিলেন 'জনসাধারণ' নামক এক অনির্দিষ্ট আইডিয়ার কবি। সেহেতু 'কবি' নজরুল 'কর্মী' নজরুলকে গ্রাস করেছিলেন সর্বাত্মকভাবে। তাই করুণ পরিণামের জন্য তিনি নিজেই দায়ী।

আমাদের জানা নেই, যদি সুস্থ হয়ে কবি জানতে পারতেন তাঁর প্রতি তথাকথিত দল-নেতাদের ব্যবহার, জনগণের ঔদাসীন্য তবে কি আগের মতন সেই প্রাণানন্দে এই জনগণের সেবার পথে নামতেন তিনি, নাকি মুখ ফিরিয়ে থাকতেন গভীর অভিমানে? কিংবা কে জানে সব ভুলে গিয়ে আবার বলে উঠতেন কিনা কোনো সভায়:

"যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছি নে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চির-দিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ

বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সঙ্গীতে কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।"[৪৩]

তথ্যপঞ্জী

১। সতীশ পাকড়াশী/অগ্নিযুগের কথা/নবজাতক প্রকাশন ১৯৮২/পৃঃ ১৩৯।

২। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর—আব্দুল মওদুদ-এর গ্রন্থে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি/ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ সং/পৃঃ ৩৪৬।

৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ/নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা/ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী/১৯৪৯/পৃঃ ১৯৫, ২০৩।

৪। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ / কাজী নজরুল প্রসঙ্গে / বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ১৩৩৬ / পৃঃ ৬৯।

৫। কেশব চৌধুরী / ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৪ / পৃঃ ৩০৭-৩০৮।

৬। সতীশ পাকড়াশী / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১০৪।

৭। শিশির কর / নিষিদ্ধ নজরুল / আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৩৬ / পৃঃ ৪।

৮। ডঃ রবীন পাল / কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ / শ্রীভূমি পাবলিকেশনস্ ১৯৫১ / পৃঃ ৩৪।

৯। আমার কৈফিয়ৎ / সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৩৪ / পৃঃ ৯০।

১০। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ / কাজী নজরুল প্রসঙ্গে / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৬৯।

১১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ / কাজী নজরুল প্রসঙ্গে / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭১-৭২।

১২। সত্য গুহ / এ কালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল / অধুনা ১৯৩৪/ পৃঃ ১২৮।

১৩। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্য সমীক্ষা / মুক্তধারা, ভারতীয় সং ১৯৫১ / পৃঃ ৫১।

১৪। কেশব চৌধুরী / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩০১।

১৫। রাজবন্দীর জবানবন্দী / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / হরফ ১৯৫১ / পৃঃ ৩২৭।

১৬। মুজফ্ফর আহম্মদ / নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৯০।

১৭। রাজবন্দীর জবানবন্দী / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / পূর্বোক্ত / হরফ ১৯৩২ / পৃঃ ৩২৯।

১৮। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / কাজী নজরুল / এ. মুখার্জী ১৯৫২ / পৃঃ ২২৩।

১৯। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৫২।

২০। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৫৩।

২১। 'যুগবাণী', মূল গ্রন্থ নজরুল কাব্যসমীক্ষা/আতাউর রহমান / পৃঃ ৫৪।

২২। ধূমকেতু, ১৯২২, ১৩ই অক্টোবর সংখ্যা / মূলগ্রন্থ—কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা. মুজফ্ফর আহম্মদ / পৃঃ ৩০২।

২৩। আনন্দময়ীর আগমনে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / হরফ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৪৮।

২৪। শিশির কর / নিষিদ্ধ নজরুল / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১০।

২৫। শিশির করের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ১২।

২৬। শিশির করের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ১২-১৩।

২৭। শিশির কর / নিষিদ্ধ নজরুল / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪১ এবং ২৯।

২৮। 'লাঙল' প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ২৩শে পৌষ, ১৩৩২।

২৯। 'লাঙল' প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা, ১লা পৌষ, ১৩৩২।

৩০। ছুঁৎ মার্গ / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / হরফ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৯৩।

৩১। লোকহিত / কালান্তর / রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড / জন্মশত-বার্ষিকী সংখ্যা / ১৩৫৩ প. ব. সরকার / পৃঃ ২২৩-২৪।

৩২। "আমাদের দেশের জনমণ্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে তুমি তাদের বিষয়ে পরিষ্কার করে আজো কিছু বলনি·········কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনো ভেবেছো কি? একটা কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি যদি তাদের কথা ভাবতে না শেখো, তা হলে তোমাকে দিয়ে দেশের কোনো

সেবাই হবে না, প্রাণ দিলেও না। ওরাই দেশের শক্তি, ওদের না জাগালে আত্মবোধ না শেখালে তোমার তথাকথিত ভদ্দর লোকেরা কিছুই করতে পারবে না, কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।"—কাজী নজরুল প্রসঙ্গে / পূর্বোক্ত। পৃঃ ৮৩-৮৪।

৩৩। মুজফ্ফর আহ্মদ। কাজী নজরুল প্রসঙ্গে। পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮৫।

৩৪। ডঃ রবিন পাল / কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ। পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৬।

৩৫। মুজফ্ফর আহ্মদ / নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা / পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩৬৫।

৩৬। নারায়ণ চৌধুরী/কাজী নজরুলের গান / এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৫৩ / পৃঃ ৫৫।

৩৭। প্যাক্ট / সঞ্চিতা / ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৫ / পৃঃ ২৪০।

৩৮। মুজফ্ফর আহ্মদ / নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৭০-৭৩।

৩৯। শেখ দরবার আলম / ঢাকায় নজরুল-প্রবন্ধ / দেশ, ৩১ আগষ্ট ১৯৫৫ সংখ্যায়।

৪০। মুজফ্ফর আহ্মদ। ঢাকায় নজরুল—প্রবন্ধ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৮১।

৪১। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / কাজী নজরুল / এ. মুখার্জী, ১৯৩১ / পৃঃ ২৩১।

৪২। মুজফ্ফর আহ্মদ / নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা। পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৬০-৪৬১।

৪৩। যদি আর বাঁশি না বাজে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / হরফ, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪০০-৪০১।

ইসলামিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা নজরুল প্রতিভার সঙ্গে যে সম্পৃক্ত হয়েছিল এর প্রকৃত প্রমাণ তাঁর ইসলামিক গান ও কবিতাগুলি। তবু আশ্চর্যজনক সংবাদ হোলো, এই নজরুলকেই অভিযুক্ত হতে হয়েছে 'কাফের' অভিধায়। এবং এই অভিধা যাঁরা দিলেন তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের তথাকথিত শিক্ষিত-বয়স্ক-মাতব্বর দল। নজরুলের ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন আঘাত—বুলবুলের মৃত্যু, নার্গিস খানমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রমীলার অসুস্থতা, পূর্ববঙ্গের ভোটযুদ্ধে নির্মম পরাজয় কিংবা ফজিলতুন্নেসার দেয়া আঘাতের তুলনায় এই ব্যাপারটিও কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ না।

নজরুলকে 'কাফের' বলার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা কি ছিল স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। নজরুল লিখছেন, "আমায় মুসলমান সমাজ কাফের খতাবের যে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি।...তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড়তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ, খৈয়াম, মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম।১"

এসব কথা নজরুল লিখছেন এক চিঠিতে। ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের চিঠির জবাবে। নজরুলের এই পত্রালাপ প্রসঙ্গে একটি দরকারী তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন মনে করি। লক্ষণীয় ব্যাপার, ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের একটা চিঠি ১৩৩৪-এর 'নওরোজ' ভাদ্রে প্রকাশ পেলে ১৩৩৪-এর-ই পৌষ 'সওগাতে' নজরুল এর জবাব লিখলেন। লিখতে গিয়ে তাঁকে বলতে হচ্ছে—

'আপনার ১৯২৫ সালে লেখা চিঠির জবাব দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে।২"

ইব্রাহিম খাঁর চিঠির জবাব যে নজরুল বেশ দেরী করে দিচ্ছিলেন তা চিঠির ভূমিকা থেকেই বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বোক্ত তথ্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি: ইব্রাহিম খাঁ আগে ব্যক্তিগতভাবে চিঠিটা নজরুলকে লিখেছিলেন, না ছাপিয়ে ১৯২৫ সালের কোনো এক সময়ে। এবং নজরুল তার কোনো জবাব দেননি। তারপর

১৯২৭-এর ভাদ্রের নওরোজে সর্বজন সমক্ষে যখন লেখা হোলো তখন তার জবাব না দিয়ে নজরুল পারেননি। এবং এ জবাব ব্যক্তিগতভাবে, মানে, তাকে পাঠিয়ে ছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু ছাপতে তাঁকে হয়েছিল।

১৯২৫-এ পাওয়া চিঠির জবাব না দেওয়া এবং ১৯২৭-এ সেই চিঠিরই জবাব লিখতে বসার মধ্যে বিচলিত ও বিষণ্ণ শিল্পী—মানসটিকে একবার দেখে নিতে হলে সঙ্গত কারণে জানতে হয়, কি ছিল সেই চিঠিতে ইব্রাহিম খাঁর? খুব সংক্ষেপে বললে, বলতে হয়, সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিতে নজরুলকে নিয়ে গর্ব করার চেষ্টা। এবং কোনো কালেই নজরুল এটা পছন্দ করেন নি। তাঁর বন্ধু বলেন, "আমি দেখেছি শুধু মুসলিম কবি হিসেবে পরিচিত হওয়া সে পছন্দ করতো না।"৩ আর, সে চিঠিতে ছিল, ব্যক্তিগত নয় শুধু, শিল্পী নজরুলের কাছে কিছু অভিযোগ, কিছু প্রত্যাশা। এবং তাই সৎ শিল্পী হিসাবে নজরুলের তখন আত্ম-উন্মোচন ছাড়া উপায় ছিলনা। সেই চিঠির দু'একটি অংশ:

(i) 'প্রভো, এ কাঙাল বাঙালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ, ওকে রক্ষা করো—সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও।৪'

(i) তোমার ক্ষেত্র মুসলিম সাহিত্যে।...বাংলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখো, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন মাত্র সিংহাসন নয়, আর বাংলার মুসলমান সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসনখানি পড়ে রয়েছে তুমি শুধু দখল করলেই হয়।৫

এজাতীয় মন্তব্যে নজরুল বিপন্ন বোধ করেছিলেন। কারণ পত্রিকায় এ লেখা দেখে পাছে সকলে তাঁকে ভুল বুঝে ফেলে। পাছে বুঝে নেয় তাঁর হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াস ভুয়ো একটা ব্যাপার। আসলে নজরুল গোঁড়া ধর্মাদর্শীদেরই তোষামদ পছন্দ করেন। নজরুল বিষণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে ভুল বুঝছে। বয়স্ক আলেমরা তাঁকে 'কাফের', বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর সময়টা ১৯২৬-এর বিষাক্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরের বছর।

তাছাড়া সমকালে মুসলমান সম্প্রদায়কে সমস্ত প্রকার গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে তুলে দেখতে চেয়েছিলেন বলেই শিল্পী নজরুল সাহিত্যেও পরিচ্ছন্ন রুচি বোধের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। অন্তত, 'ইসলামী সাহিত্য' বলে নিতান্ত শিল্প গুনহীন রচনা তিনি লিখতে চাননি।

"আমি হজরতুল ইসলাম লিখব না সত্যিকার কাব্য লিখব ?

এঁরা কি মনে করেন হিন্দু দেবদেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে ? তা হলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই হবেনা— জৈগুন বিবির পুঁথি ছাড়া।

বিদ্রূপ আমি করছিনে বন্ধু এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলা-বৃষ্টি। সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়—তা হলে তার মঙ্গলের জন্ত আমি আমার কাব্যকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ ক্রটি কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে তা সত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি।

কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ-ক্রটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতেও চাইলে এরা তার বিকৃত অর্থ ধরে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুরিই মেরে বসবে।

যাঁরা মনে করেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলা-মের বিরুদ্ধে অভিমান ? এ ভুল যাঁরা করেন তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে।৬"

যাঁরা নজরুলকে কাফের অভিধা দিতে উদ্‌গ্রীব তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে নজরুলের চেয়ে আরো তা কেউ বেশী করে জানেন না। কিংবা জানলেও কোন্ বিদ্রোহী এমন করে প্রচার করেছেন ?

"আমাদের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে গোঁড়ামি যে কুসংস্কার তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মৌলানা মৌলভী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষু কর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি কিন্তু কবি মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষম করা যায়।৭"

বাংলার মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'মোল্লা চিত্র' নামে

একটি ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। ২৪ পংক্তির পেয়ারে লেখা দীর্ঘ কবিতাটি, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় সেপ্টেম্বর/অক্টোবর সংখ্যায় ছাপা হয়। নজরুলের বয়স তখন চার বছর।

ঐ ব্যঙ্গ কবিতাটিতে বাংলার মোল্লাতন্ত্রের মূর্খতা, অন্ধ বিশ্বাস, লোভ এবং আত্মম্ভরিতার রীতিমত বাস্তব তথ্য আছে। তীব্র সমাজ সচেতন মনের অধিকারী হোসেন সিরাজী, মোল্লারা যে বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরায় স্বরূপ ঐ কবিতায় তা স্পষ্ট করেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ এই রকম:

মোস্লেমে গরীব আল্লাহ্ করেছে ধরায়
যেখানে সেখানে এরা কহিয়া বেড়ায়
বাঙ্গালা ইংরেজী পড়া কয়রে হারাম
বাঙ্গালার মোল্লাদের চরণে সালাম।
....
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তি সম জ্ঞানী
দাল্লিম জাল্লিম লয়ে করে হানা হানি।
তালাক নেকার কামে অতিশয় পটু
আহারে মজবুত যেন ব্রাহ্মণের বটু
ফাতোয়া কাবাজ লয়ে সদা মারামারি
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা যাই বলিহারি।৮

[তুলনীয় নজরুল, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজিছে ফেকা ও হাদীস চষে।৯] নজরুল ইসলাম এই তিক্ত সমাজ অভিজ্ঞতারই উত্তরসূরী।১০

বাংলার মুসলমানকে এই মোল্লা সম্প্রদায়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বারবার সোচ্চার হয়েছিল নজরুল।

"আজ মোল্লা মৌলভী সাহেবদের মুসলমানীর ফকরের কাছে টেকা দায়। ......অনন্ত দিক যাকে ধরতে পারেনি সেই পরম দিগম্বরের করুণা পাবে এই সব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য লোভীর দল? যে জাতির পবিত্র কোরানের প্রথম শিক্ষা আল হামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামিন' সমস্ত প্রশংসা মহিমা যশ খ্যাতি আল্লাহর প্রাপ্য আমার নয়—সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ করেও যাঁরা ভোগের পাঁকে পড়ে রইলেন কর্দম বিলাসী মহিষের মত—তাঁরা আর যাই হন আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কৃপা পাননি।১১"

শতশত বছর ধরে চলে আসা মুসলমান সমাজের সংস্কারের ভিত্তিমূলে এমন

সজোর আঘাত আর কেউ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশে ও এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু শুভ হয়নি নজরুলের জীবনে। তাঁর অসুস্থতার আগে এবং পরে, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে—'ধর্মদ্রোহী' 'হিন্দু জীবনচর্যায় অভ্যস্ত' 'শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা' 'তন্ত্র সাধক'—নজরুলের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা হয়েছে মুসলমান সমাজ থেকেই।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল, ৯১ হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটার হলে শিশির কুমার ভাদুড়ী নজরুলকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই সভায় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আবার বাংলা ১৩৩৬ সালেও নজরুলকে জাতীয় সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা হলে মুসলমান লেখকরা দ্বিমত পোষণ করেন। মোহাম্মদ আকরম খাঁ নজরুলকে সম্বর্ধনা দানের ব্যাপারে বিরুদ্ধতা করেন।[১২]

অথচ গভীর ঐকান্তিকতায় এই সমাজের মঙ্গল তিনি করতে চেয়েছিলেন। ভেবে ছিলেন এ ব্যাপরে সার্বিক সহযোগিতা তিনি পাবেন তরুণ মুসলিম সমাজের কাছ থেকে। এ রকম আশার কথা তিনি একাধিক বার ঘোষণা করেছেন। তরুণ মুসলিমদের সম্বন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয়ঋদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে অনেক-বার অনেক সভায়:

"আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারেন তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধিনিষেধের দুস্তর পাথার। এই সব লঙ্ঘন করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের—তাহারা তরুণ।[১৩]

অন্যত্র:

"তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কাবা শরীফ জিয়ারত করলাম, যাদের চোখে দেখেছি তৌহিদের রওশনী, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ তারেক মুসার ছবি, যাদের মক্তব মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র। যাদের বাজুতে দেখেছি আলি হায়দারের বে-দেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজান ধ্বনি। তোমরা আমরা সেই ধ্যানের মানব গোষ্ঠী।" [১৪]

এইখানে স্মরণে রাখতে হবে যে, নজরুলের সমকালে রুশ বিপ্লবের প্রভাব একদিকে যেমন ভারতের অধিকাংশ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে নতুন

জাগরণের সাড়া তুলেছিল, ঠিক তেমনি তুরস্কের নবজাগরণ ও ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধিজীবী মহলকে আলোড়িত করেছিল। ইউরোপীয় শাসন পাশ থেকে একে একে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র নিজেকে ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হচ্ছিল সে সময়ে, তখন "ইসলাম অনুরাগী ভারতীয় জনতাকে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করা ও তাঁদের সামাজিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।" ১৫ উর্দু কবি ইকবালের মধ্যে এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইকবালের জীবন দর্শনের সাথে নজরুলের এই দিক থেকে গভীর সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। ইংরেজের পদানত, পরাধীন সংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পক্ষপাতী ছিলেন ইকবাল। ইসলামের বর্তমান দুর্গতির জন্য ঈশ্বরকেও 'হরজাই' বলে ওঠেন তিনি তাঁর শিকোয়ায়। নজরুলের মধ্যেও এই অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ। "প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সাল থেকে কিংবা তার কিছু আগে থেকেই তামাম মুসলিম জাহানের যে যে দেশ ইউরোপের সফেদ জাতিগুলির অধীনে ছিল তারা তখন আজাদির জন্য জান কবুল করে তাল ঠুকে গর্দান খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। আঙ্গোরায় আনোয়ার পাশা, তুর্কিতে কামাল পাশা, আরবে ইব্‌নে সৌদ; মিশরে জগলুল পাশা, মরক্কোয় গাজী আব্দুল করিম প্রমুখ তখন ইউরোপীয়দের ভয়ের কারণ, নিদ্রায় দুঃস্বপ্নের মত রূপ নিয়ে ছিল। তাই নজরুল ইসলাম তখন ভারতের মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে তেতিয়ে তুলেছিলেন এবং মুসলমান ধর্মে কি বলে তা তাঁর অগ্নিময় বাণীর মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের শোনাচ্ছিলেন"।১৬

মনে রাখতে হবে নজরুলের এই ইসলামিক ঐতিহ্য প্রীতির সঙ্গে এক 'নস্ট্যালজিক' অনুভূতি যুক্ত হলেও, তা ছিল না একান্ত ভাবে পশ্চিম মুখী (আরবীয়) আত্মমগ্নতা। তা ছিল আত্মজাগরণের উদ্দীপক। একটি ভাষণের অংশ বিশেষ এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে নজরুলের :

"কোথায় সে শমসের কোথায় সে বাজু, সে দরাজ দস্ত, বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি করে। যে কওম, যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে, যে পথে তারা একদিন

পারস্য সাম্রাজ্য, রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিল। আঁধার বিশ্বে তৌহিদের বাণী শুনিয়েছিল"।[১৭]

এই ইসলামিক ঐতিহ্য প্রীতিতে 'মোসলেম ভারতে'র পাতায় ভরে উঠেছিল ইসলামিক ঐতিহ্য ঋদ্ধ কবিতাবলী ও ইসলামের ত্যাগ শৌর্য ও বীরত্ব এই পরাধীন হীণবল দুর্বল জাতির জাগরণ মন্ত্র হোক—এটা চেয়েছিলেন নজরুল মনে প্রাণে। এক দিকে ইসলামের অতীত ঐতিহ্যের স্বর্ণযুগের স্মরণ, অন্যদিকে বর্তমানের মুসলমান সমাজের অধঃপতনের, কুসংস্কারের, বাস্তব, বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা—এ দুয়েরই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নজরুল। বিদ্রোহী কবি কেবল ইংরেজের শাসন-পাশ থেকে দেশের স্বাধীনতা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সর্বপ্রকার সামাজিক সংস্কার হীনতাও। মুসলমান "সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার নিরাকরণ করো"[১৮] তরুণদের কাছে এই ছিল তাঁর আবেদন।

মুসলমান তরুণ সমাজের সাহায্য নিয়ে নজরুল এই সমাজের সকল প্রকার অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নজরুল লিখছেন এক চিঠিতে—"আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না।...ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র চিকিৎসককে।...আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই তাঁদের দিয়ে সমাজসেবা হয়তো চলবে না। এইজন্য আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতী দলকে।[১৯]" অন্যত্র বলছেন "যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই।"[২০] যৌবনের বন্দনা বারবার তাই করতে হয় কবিকে। 'যৌবন জলতরঙ্গ' এই যৌবন বন্দনার শ্রেষ্ঠ কবিতা। বলাকার সবুজের অভিযান প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণে আসতে পারে। কিন্তু সবুজের অভিযানের তুলনায় 'যৌবন জলতরঙ্গ' কবিতাটি অনেক মাত্রায় সমাজকেন্দ্রিক। 'সবুজের অভিযানে' আপন অজান্তে হয়তো আন্তর্জাতিক সমস্যার মেঘ ছায়া ফেলেছে। কিন্তু 'যৌবন জলতরঙ্গ' কবিতাটি মূলত সমাজ সংস্কারমূলক কবিতা। বলা বাহুল্য সে সমাজ মুসলমান সমাজ। মুসলমান সমাজের মাতব্বরদের নির্দেশ-

নামায় বিরুদ্ধাচারী নজরুল যৌবন জলতরঙ্গকে স্বপক্ষে আনবার উদ্দেশ্যে এ কবিতা লিখেছেন মনে হয়।

জিঞ্জির পায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল
আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল
... ...
যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন
মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
... ...
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ।
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি খালি বলিব ইন্নারাজে-উন ২১।"

নজরুল তাঁর বিভিন্ন রচনায় কবিতায় ও ভাষণে বাঙালী মুসলমান মৌলভী-দের প্রতি খড়্গ হস্ত হয়েছেন। এইমাত্র উদ্ধৃত কবিতায়ও বৃদ্ধত্বের প্রতীক সেই মোল্লাতন্ত্রই কবির আক্রম্য অনুমান করা যায়।

অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই এবং মুসলমান সমাজের প্রতি মানবিক আন্তরিকতা ছিল বলেই তিনি বাংলার অনুন্নত মুসলমান সমাজের পাশাপাশি হিন্দু সামজকে রেখে তুলনা করতে চেয়েছেন। এ তুলনায় এক সংস্কারকামী প্রগতিশীল মুক্ত এবং বিবেচক মানুষের মানসিকতাই প্রকাশিত। সংকীর্ণ ঈর্ষা ও ভেদজ্ঞান নয় কখনোই। নজরুল বলছেন:

"আজ আমরা বাংলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট। আমাদের সংঘ নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি কি অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ এক প্রাণ ২২।" হিন্দু এবং মুসলমানের সামাজিক যে দূরত্ববোধ গড়ে উঠেছে যার আঘাত থেকে তিনি নিজেও অব্যাহতি পাননি।২৩ অথচ এ সম্বন্ধে যথার্থ সমাজ বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত করেছেন নজরুল:

আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনি চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ মজুরদের আর—আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে

বেশী—দেখে মনে করে মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়তো বা যথা পূর্বং তথা পরং। দরিদ্র মূর্খ কলিমুদ্দি মিয়াই তার কাছে এভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।[২৪]"

এই দূরত্ববোধের সমস্যা উত্তরণের একমাত্র পন্থা, এবং তাছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই, দেখাতে চেষ্টা করেছেন নজরুল। তাঁর মতে যে ফার্সি ভাষা এক কালে রাজভাষা ছিল এখন তা অবহেলিত। রাজভাষা থাকার দরুণ একসময়ে হিন্দুরাও এই ভাষার চর্চা করতেন এবং সেই সূত্রে ইসলামের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে সেই ভাষার চর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ ইসলামিক ঐতিহ্যের সংবাদ পাওয়া আরবি ফার্সিকে বাদ দিয়ে অসম্ভব। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দূরত্ববোধ গড়ে উঠলো তার সেতুবন্ধন সম্ভব হোতো, আরবি ফার্সির অনুবাদ চর্চার মাধ্যমে। এবং এ দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে নিতে হোতো মুসলমানদের। কিন্তু তাঁরা সে ব্যাপারে চেষ্টিত হন নি। নজরুলের কালে তো বটে একালে বা সে কাজ কতটা এবং কিইবা হয়েছে ভেবে দেখতে হবে। নজরুল দুঃখ করেছেন: "সাধারণ মুসলমান বাঙ্গালা ভালো করে শেখেন না, তাও আবার আরবি ফার্সি...... আর যাঁরা ও-ভাষা শেখেন তাঁদের অবস্থা পড়ে ফার্সি বেচে তেল! আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানিনা। সে অমৃত তাঁরা একা পান করেই খোদার খাসি হয়েছেন।[২৫]"

ফলতঃ বেড়ে উঠেছে দূরত্ববোধ। অজ্ঞতা, বোঝাপড়ার অভাবহেতু ঘৃণার প্রাচীর হয়েছে সুদৃঢ় আর প্রাচীরের অন্তরালে তথাকথিত মৌলভী মোল্লাদের হাতে আত্মসমর্পিত মুসলমান সম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিত কলার চর্চাকে কেবল পরিত্যাগই করেনি, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা এ ব্যাপারে চেষ্টিত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে অপপ্রচারও চালানো হয়েছে গোঁড়া ধর্মাদর্শীদের দ্বারা। [অবশ্য এই প্রসঙ্গে আরও একটি চিন্তা জুড়ে নিতে হবে, ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা থেকেও অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। কারণ বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে যে অবজ্ঞা ও অসদ্ভাব দেখা দেয় ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে তা ঘটেছিল। এবং মৌলানা মৌলভীরা এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের 'জ্ঞান' দিচ্ছিলেন। পরামর্শ দিচ্ছিলেন আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে থাকতে।]

সংস্কৃতির এই দুস্থতার সময়েই নজরুল ইসলাম পরিশ্রমী হলেন বাংলার মুসলমানদের বাঁচাতে। সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চার ভেতর দিয়ে তা আরম্ভ করেছিলেন তিনি। এবং এই কাজের ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনিই হলেন গোঁড়াদের আক্রম্য। যতদূর মনে হয়, সঙ্গীত চর্চার জন্য নজরুল তাঁর সম্প্রদায়ে নিন্দিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য জীবনীকারেরা বিশেষ কোনো তথ্য পরিবেশন করেননি। কেন করেননি তা ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সঙ্গীত চর্চার জন্য নজরুলের যে বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর দু' একটি বক্তব্য থেকে। কাব্যের চেয়ে সঙ্গীতেই তাঁর প্রতিভার মহত্তর বিকাশ ঘটেছে বলে তিনি স্বীকার করেন। তবু তাঁর সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে এমন কোনো ব্যাপার বুঝি জড়িত আছে যার জন্য তাঁকে বলতে হয়, "সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

......

বিধি নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যার স্বভাব সেই গানের পাখীকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইবে? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফ্‌রীর ফতোয়া দিবে?

এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা পাইয়া আসিয়াছিল আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে।২৬"

এই দীপ্ত ঘোষণার আট বছর পরে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উস্তাদ জমীরুদ্দী খাঁর শোকসভায় এই কথাই বলতে গিয়ে, লক্ষ্য করা যায়, নজরুল যেন এমন তেজ এবং জোরের সঙ্গে বলতে পারছেন না। নিজে যদিও সুরের চর্চা থেকে সরে আসেননি তবে একথা ঠিক যে 'তর্ক করার স্পৃহা' যেন ত্যাগ করেছেন তিনি। এই হতাশা ও অসহায়ত্ব কি নিতান্তই কারণহীন? সন্দেহ হয়।

মুসলমান সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে নজরুল ভাবিত ছিলেন রীতিমত। এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন পর্দা প্রথা ও নারী শিক্ষার কথা। তৎকালের শিক্ষিত মুসলমান নারীদের সম্পর্কে নজরুলের অসীম শ্রদ্ধার

প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও দু'একটি চিঠিপত্রে মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথার ব্যাপারে তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন :

আমাদের দুয়ারের সামনের ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলা দেশের স্বল্প-শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।......ফাঁসীর কয়েদীদেরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।" ২৭

নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা :

কন্যাকে পুত্রের মতই আমাদের শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখাই ক্ষান্ত হই নাই অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনই পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। [প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সাহাবানু মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান মহিলারাও মিছিলে নেমে ছিলেন !!] ইহাদের কি দুঃখ, কিসের অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফকর করি, অথচ জানি না সর্বপ্রথম মুসলমানদের নর নহে নারী"।২৮ এসব কথা নজরুল বলেছিলেন ১৯৩২ সালে। এত বছর পরেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের সামাজিক অবস্থার কতখানি উন্নতি হয়েছে তা প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

যাই হোক, কুসংস্কার যে মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই, স্পষ্টভাষী নজরুল সংখ্যা বৃদ্ধিকারী এই বুদ্ধিহীন সম্প্রদায়কে তীব্র ভাষায় গালি দিয়েছেন,

"পশুর মত সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি ? যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে ? ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছে।২৯ অন্যত্র, "এই বাংলায় নাকি শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান। কিন্তু গুণতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে বাংলার সত্যকার গৌরব করার কতটুকু আছে তা হিসাব

করতে গেলে মনে হয় আমরা শতকরা পাঁচ জন হলেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দুঃখে তাই বলেছিলাম—

'ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত। ৩০

হাতে শক্তি, বিগত গৌরব, আচার সর্বস্ব এই মুসলিম সম্পর্কে নজরুল চরম সত্যবাণী শোনান।

দামামা তো আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে লজ্জা কোথায় রাখি
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি।

... ...

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদীস চষে। ৩১

কেবল কবিতায় নয়, এই একই কথা সভায় সমিতিতেও তাঁকে শোনাতে হয়েছে। নজরুলের প্রত্যাশা ছিল ঈর্ষার কলহে ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন এই সম্প্রদায়কে একটি বৃন্তে বাঁধতে পারে মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়। নজরুলের এ প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। শুধু তাই নয়, সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে চলেছিল অপপ্রচার। নজরুল আহত ও আশাহত হয়েছিলেন। গুটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন নিজেকে নিজের মধ্যে। ইত্যবসরে এই আহত মানুষটির সাংসারিক জীবনে নেমে এসেছিল দুর্যোগ। ১ম পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিল, প্রমীলা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন, মানসী ফজিলতুন্নেশার নিষ্ঠুর প্রত্যাখানও বুকে বেজেছিল হয়তো, দেখা দিয়েছিল আর্থিক অনটন। দেশ সমাজ ও জাতি তথা সম্প্রদায় তাঁকে ভুল বুঝেছিল। ফলতঃ একটা অব্যবস্থিত চিত্ততার ভেতর থেকে তিনি পরিত্রাণ খুঁজছিলেন সঙ্গীতে এবং আধ্যাত্মিকতায়। এই সব সূত্রেই বরদাচরণ মজুমদারের তন্ত্র সাধনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বোধ করি।

অত্যন্ত অভিমানে ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠস্বরে যে গভীর নৈরাশ্যের সুর ফুটে উঠেছে তা অসাধারণ। "সে আশা আমার আজও ফললো না। বুঝি মুকুলেই তা পড়লো ধূলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে।"৩২

নজরুল আয়ু পেয়েছিলেন ৭৭ বছর। বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৩ বছর।

আর ২৩ বছরের কবি ও কর্মীজীবন নিরুপদ্রব ছিলনা তাঁর। এ তো প্রমাণিত। কিন্তু এই সীমিত সময়ের মধ্যেও তিনি কাজ কম করেননি। অথচ তাঁর মানসিক মৃত্যুর ৪৪ বছর পরেও (অসুস্থতা ধরাপড়ে ১৯৪২, জুলাই ৯তে) তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ণ হোলো না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা ইত্যাদি ছাপিয়েও তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল মনে হয় তাঁর সমাজ, তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনের চেষ্টা। এই ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ হয়ে বলে গেছেন, "দুঃখ হয় এদেশে কেন জন্মালাম—এই নিন্দুকের হিংসুকের দেশে।... মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে, পিঁজরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ, এই পশুর জন্যই আমি গান গাই। তারই জন্য আছি আজো বেঁচে।"৩৩ ১৯২৭-এর শেষের দিকে লেখা এ চিঠিতে নজরুলের বিষণ্ন মনের ছায়া আছে। বিষণ্ন এবং হতাশ। নজরুল লিখছেন :

"আমি তোমাদের—তরুণদের হাত তৈরী করবার ভার নিতে গিয়ে ভুল করেছিলাম—ও কাজ কর্মীর। ও ভারও যে নিতে পারিনে, তা নয়। কিন্তু মন তৈরীর ভার নেবে কে তা হলে? দুইই সম্ভব হোতো আমায় দিয়ে, যদি আমায় অতি সাধারণ জীবন যাপনের জন্য এত ভাবতে না হ'ত। আমি অর্থ উপার্জন ছাড়া বোধ হয় জগতের সব কিছু করতে পারি। ঐ জিনিসটের মালিক হতে হ'লে যতটা নীচে নামতে হয় ততটা নামার দুঃসাহস আমার নেই।"৩৪

এই সব লেখার পর ১৫ বছর সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন কবি। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা কি দিনে দিনে ক্লান্ত করে তুলেছিল কবিকে? নিখিল নাস্তির মধ্যে ডুবে যাবার আগে কি আর একবার স্বপ্ন দেখতে চেয়ে ছিলেন কবি?

"ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপ্নচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী। The sound of the bell that leaves the bell itself." তার পরেই সে বলে : আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে, তারই অতলতায় ডুব দেবার জন্য আমার এ গান শোনা। শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে, ধূলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশী, তুরস্কের নেকা পরা মেয়ের মোমের মত

দেহ। তখনো চারপাশে কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ির হোলি খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি—Thou wast not born for death immortal bird।৩৫"

দুঃখজনকভাবে একথা স্মরণ করতে হয় যে, নজরুলই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ব্যর্থ পরিশ্রমী, যিনি চেয়েছিলেন এ দেশের মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি। 'যিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যেকার হাজারো বিভেদ দূর করে এবং হিন্দু মুসলমানের গভীর দূরত্বের অপনোদন ঘটিয়ে একই বৃন্তে সবাইকে ফুটিয়ে তুলতে। এর ফল স্বরূপ মুসলমান সমাজও তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি। এবং হিন্দুরাও মেনে নিতে পারেননি তাঁকে। নজরুলের দুর্ভাগ্য এইখানে।

তথ্যপঞ্জী

নজরুল ইসলাম ও মুসলমান সমাজ

১। চিঠিপত্র, নজরুল রচনা সম্ভার, তয়/হরফ ১৯৩৫ সন/পৃঃ ৪৩৫

২। চিঠিপত্র, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৩৩

৩। মুজফ্ফর আহম্মদ/নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা/ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী/১৯৩১। পৃঃ ১৫৬।

৪। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত/জ্যৈষ্ঠের ঝড়/ আনন্দধারা ১৩৩১ সন / পৃঃ ২৩৭ থেকে উদ্ধৃত।

৫। অচিন্ত্য সেনগুপ্তর পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ২৪০।

৬। চিঠিপত্র,/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৪০—৪৪১।

৭। তরুণের সাধনা/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭০।

৮। কাজী আব্দুল মান্নান/আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫ সন/পৃঃ ২০১-২০৩ থেকে উদ্ধৃত।

৯। 'খালেদ' কবিতা/নজরুল রচনা সমভার/৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৫৭।

১০। কাজী আব্দুল মান্নান/ পূর্বোক্ত গ্রন্থ/ পৃঃ ২০৪।

১১। আল্লহর পথে আত্মসমর্পন/নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৪।

১২। অমলেন্দু দে / বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ / রত্নাপ্রকাশনী ১৯৩৫ সন, পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

১৩। তরুণের সাধনা/নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৪।

১৪। বাজলার মুসলিমকে বাঁচাও/নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮১।

১৫। কেশব চৌধুরী / ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯২৯/পৃঃ ২৯৮।

১৬। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়/কাজী নজরুল/এ. মুখার্জী ১৯২৯/পৃঃ ২৪০।

১৭। বাজলার মুসলিমকে বাঁচাও/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৮২।

১৮। বাজলার মুসলিমকে বাঁচাও/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৮৩।

১৯। চিঠি পত্র/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৩৬।

২০। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭০।

২১। যৌবন জল তরঙ্গ/সঞ্চিতা/ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩২৯/ পৃঃ ২৩১ ৩২।

২২। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭১-৭২।

২৩। সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর শ্রদ্ধেয় শৈলজার মেসে মুসলমান বলে নজরুলের বাসন চাকর ধুতে পারেনি, দ্রঃ 'আমার বন্ধু নজরুল' সন ১৯৬৮, পৃঃ ২২৬-২২৭, এক বিবাহ সভায় 'মুসলমান' নজরুল উপস্থিত ছিলেন বলে কিছু গোঁড়া হিন্দু আপত্তি তুলেছিলেন। দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত সন, পৃঃ ৪০৪-৪০৫।

২৪। মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৮।

২৫। মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৯।

২৬। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৩।

২৭। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭১।

২৮। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭১।

২৯। তরুণের সাধনা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৭৩।

৩০। বাজলার মুসলিমকে বাঁচাও/পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮৩।

৩১। খালিদ/পূর্বোক্ত।

৩২। চিঠিপত্র। পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৩২।

৩৩। তদেব।

৩৪। বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৩৫।

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী সত্তার রূপায়ণের পেছনে ছিল তাঁর গভীর রোমান্টিক মন। এই রোমান্টিকতার উৎস ছিল নিশ্চয়ই গ্রামজীবনের (বর্ধমান/বীরভূমের) উন্মুক্ত, উদার, উদাস প্রকৃতি; রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীতাবলী; আরবি ও ফারসি সাহিত্যের সুরা সাকীর জগৎ এবং আকৈশোর সঞ্চিত একাধিক প্রণয়ের মিলন ও বেদনার শক্তি। এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল নজরুলের বিদ্রোহী ও বিরহী সত্তা। সমস্ত রোমান্টিকের মত প্রেম এবং প্রকৃতিকে অবলম্বন করে নজরুলেরও রোমান্টিক সত্তার অভিব্যক্তি। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে ঘিরে নজরুলের রোমান্টিকতার স্ফূর্তি ঘটেনি। 'সিন্ধু' কিংবা বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারির, মত ব্যতিক্রান্ত দু' একটি কবিতা লিখলেও লক্ষ্য করা যায় সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃতি তাঁর অবরুদ্ধ হৃদয় ক্ষত প্রকাশের উদ্দীপন বিভাব মাত্র, অবলম্বন বিভাব 'প্রেম'। নারীপ্রেম নজরুল নিজেই তা স্বীকার করেন—। নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবিপ্রাণ। যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।'

নজরুলের রোমান্টিক কবিতার দুই স্তর। প্রেম এবং প্রকৃতি। প্রেম কবিতাগুলির মধ্যে আছে সুতীব্র দেহাসক্তির সঙ্গে নিবিড় জীবন সংরাগ একদিকে, অন্যদিকে এক বিরহীসত্তা, অতৃপ্ত বাসনামত্ত প্রনয়লিপ্সু এক পুরুষ হৃদয়। আর নারীসত্তার তিন রূপঃ এক—নিষ্ঠুরা ছলনাময়ী লোভী স্বার্থপর নারী; দুই—মধুর মিষ্টি প্রণয়িনী—বয়সের দিক থেকেও যার পরিপূর্ণতা আসেনি। তিন, পরিণত মনস্কা, পুরুষের গভীর আনুগত্যের প্রতি নিরাসক্তা, কখনো বা অন্যাসক্তা এক গরবিনী। [এছাড়াও নজরুলের কয়েকটি কবিতায়, (আশান্বিতা, অবেলার ডাক) বেশী করে গানে এক অনুতপ্তা, ক্ষমাপ্রার্থিণী রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যে নারী তার পূর্বতন নিষ্ঠুরতার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু প্রিয়হীন শূন্যতায় তার অনুতাপ, অসময়ের যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তোলে।]

খুঁজে দেখলে বোঝা যাবে এই তিন স্তরেই নজরুল ব্যক্তিগতভাবে এক একজন নারী (যাঁরা তার জীবনে এসেছিলেন)-রূপ তুলে ধরেছেন। প্রথমা সেই কিশোর প্রেমের সঙ্গিনী, আমাদের নাম-না-জানা সেই মেয়ে, আমরা তাঁকে ব্যথার দানের মানসী বলেই জানি। যাঁরা মাথার কাঁটা ছিল কবির সৈনিক জীবনের রোমান্সের মূলে। তাঁকে পাননি কবি। 'ব্যথার দান' পর্বে তাঁরই অবিসংবাদিত প্রভাব। নার্গিস আসার খানম এই- স্তরেরই দ্বিতীয় নারী,

প্রতারণায় যার প্রেম কলুষিত বলে কবি ভাবেন। নজরুলের বিদ্রোহের জালাকর অভিজ্ঞতার পেছনে এই দুই প্রেমের রক্তরাগ, আলতা স্মৃতি নিশ্চিত ভাবে বর্তমান। পরবর্তী স্তরে এসেছেন প্রমীলা। তখনো বালিকা মাত্র। 'অস্ফুটজবা চাঁপা কুঁড়ি তুই'২ দোলন চাঁপার যুগের সেই নারী কবিকে মগ্ন রেখেছিল। [......স্মরণে রাখা ভালো উদ্ধৃত কবিতা অংশটি দোলন চাঁপা কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য হরফ-এর নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ডেও কবিতাটি সংকলিত। আর সেখানে রচনার তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে ফাল্গুন ১৩২৭। এই তারিখ যদি সত্য হয়, তবে কবিতাটি প্রমীলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগের রচনা। কেননা ১৯২১-এর মার্চ-এপ্রিলের আগে নজরুল কুমিল্লা যাননি।৩ অর্থাৎ ১৩২৭ এর চৈত্রের আগে নয়। যাই হোক, কবিতাটিতে সেই যুগের প্রমীলা সেনগুপ্তের বালিকা কিশোরীরই আভাস। আর কবিতাটি যে প্রমীলার সঙ্গে সাক্ষাতের পরের রচনা শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর সাহেব তা স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন।৪] এই স্তরের প্রেম কবিতায় তাই একটা স্নিগ্ধ মেদুর স্পর্শ পাওয়া যাবে। নাকি ভুল বলা হোলো, ঐ সময়ের মিষ্টি মধুর প্রণয় কবিতায় এই নারীরই উপস্থিতি আর দগদগে ক্ষতের ব্যথা উৎস থেকে উৎসারিত কবিতায় পূর্বতন দুই প্রেমের অভিজ্ঞতা এসে পড়ে। এবং প্রায় একই সঙ্গে লেখা হয়েছে এই দুই স্তরের-ই কবিতা এবং রাজনীতি আশ্রয়ী বিদ্রোহাত্মক গান ও কবিতাও। তৃতীয় স্তরের কবিতায় আছেন আর এক রমনী। ফজিলতুন্নেসা। ঢাকার অঙ্ক শাস্ত্রের এম.এ. শিক্ষিতা, উচ্চাভিলাসিনী মুসলিম নারী, বিবাহিত নজরুল ১৯২৭-এর শেষ দিকে ঢাকায় গিয়ে এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁকে দেখেন, পরিচিত হন তাঁর সাথে ও গভীর প্রেমে আপ্লুত হন। কিন্তু সেই রমণী নজরুলকে গ্রহণ করতে পারেন নি প্রেমিকের মর্যাদায়। তার এই অবহেলা তৃতীয় বারের মত এক জালাকর এবং সম্ভবত অপমানকর আত্মাধিকারে ও ডুবিয়ে দেয় কবিকে। তাই সেই অসীম দুঃখ ও অপমান নজরুলকে ক্রমশ তীব্র অভিমানে আত্মসংকোচনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন ওপার বাংলার সৈয়দ আলি আসরাফ তাঁর 'নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়' গ্রন্থে, এবং এপারের প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের এক অধ্যায়ে। আর অধ্যাপক মোতাহার হোসেন-কে লিখিত নজরুলের বেশ কয়েকটা চিঠি যেগুলি হরফ-এর নজরুল রচনাসম্ভার ৩য় খণ্ডে মুদ্রিত আছে, তাতেও নজরুলের এই সময়কার মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট।

দেখা যাবে, ১৯২৭ এর পর থেকে নজরুলের অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় লেগেছে এক নৈরাশ্যের সুর। আ-কৈশোর প্রেমের অতৃপ্তি এই রস-প্রৌঢ় প্রণয় প্রত্যাখ্যানে আলোড়িত হয়েছে। ফলত: তাঁর প্রেম—কবিতা লাভ করেছে বৈচিত্র্য এবং গতি। বলা বাহুল্য, শেষের কবিতা গুলিতে তাই যুক্ত হয়েছে সমস্ত-প্রকারের অভিজ্ঞতারই নির্যাস। এবং এটাই স্বাভাবিক। বিদ্রোহের প্রবাহ এবং উত্তেজনার সাথে মিশেছে রিক্ততার তপ্ত অশ্রু। মনে রাখতে হবে এই বিদ্রোহ বর্জিত ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেখা নয়। মধুসূদন বসু তাঁর 'নজরুল কাব্য পরিচয়ে' লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের 'অশীতি বার্ষিকী' জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি কবিতাটিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে গিয়া নজরুল বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্র সান্নিধ্যে আসিয়াই তিনি এই জাতীয় কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

হে রস শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নব জন্ম কথা!
আনন্দ সুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নিগিরি গিরি মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহ জ্বালা, ৫"

বক্তব্যটিতে নজরুলের মানসিকতার অপব্যাখ্যা হয়েছে। নজরুল রবীন্দ্র সান্নিধ্যে গিয়ে বিদ্রোহ বর্জিত ভঙ্গি আয়ত্ব করেছেন, পূর্বোক্ত কবিতায় একথা বলতে চান নি। 'নবজন্ম কথা' শব্দ টিকে মনে রেখে ও একথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে নজরুল দাহন জ্বালা জুড়িয়েছেন সত্য, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে এক গভীর প্রশান্ত আনন্দ লাভ করা যেতো একথা অনেকের মত নজরুল ও বলেছেন, এবং এটুকুই মাত্র তাঁর বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের আগে থেকেই নজরুলের রচনায় রোমান্টিকতার সাথে বিদ্রোহের মিশ্রিত অনুভব দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে তো তাঁর আগে থেকেই আলাপ। সৈনিক জীবন থেকেই নজরুলের রোমান্টিক মন রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্ত করে নিয়েছিল। ব্যথারদানে তাঁর অজস্র রবীন্দ্র উদ্ধৃতি প্রমাণ করে, তাঁর রোমান্টিক মনের প্রেক্ষাপট অনেক আগে থেকেই তৈরী ছিল। আর রোমান্টিক বলেই তো নজরুল বিদ্রোহী হতে পেরে ছিলেন এটা আমরা ভুলে যাই কেন? "আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে

বিভোর সৃষ্টির ব্যাথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ ৬ এতো নজরুলেরই কথা।

নজরুলের তীব্র বিদ্রোহের কবিতায়ও রোমান্টিক অনুভূতির অনুরনণ লক্ষ্য করে কেউ কেউ রসসমীকরণে কবির ত্রুটির অনুসন্ধান করলেও একথা আমাদের জানা দরকার যে নজরুল রোমান্টিক মূলতঃ বিদ্রোহী নন। আর এই রোমান্সই তাঁকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এক ইউটোপীয় রাজনীতির জগৎ। এবং সে জগৎ গড়ে তোলার জন্য তিনি চির বিদ্রোহী। অতৃপ্ত প্রেমের বাসনামগ্নতা যে নজরুলকে বিপ্লবের রক্ত অশ্বের সওয়ার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে নার্গিস আসার খানকে লেখা পত্রে নজরুলের একটা বাক্য মনে পড়ে, "তুমি এই আগুনের পরশ মানিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না, ৭ [যদিও নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে আলাপের আগে থেকেই নজরুল বিদ্রোহাত্মক বেশ কিছু কবিতা লিখে ফেলে ছিলেন। ৮] এ বিষয়ে-প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য আছে পূজারিণী কবিতায়।

'পূজারিণী' কবিতা কবির প্রেম বুভুক্ষু হৃদয়ের এক ধারাবাহিক ইতিহাস। কবিতাটির রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩০। অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২২—২৩ সাল। প্রমীলার সঙ্গে প্রেম পর্বের কবিতা এটি। কিন্তু এর মধ্যে আছে, ব্যথার দানের-মানসী, কুমিল্লার নার্গিস এবং কবি জীবনে তখনো অনাগতা অন্য সব রমণী।

নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণে, নারীর প্রত্যাখ্যানের গভীর বেদনায় আলোড়িত কবি-সত্তার দুর্দান্ত প্রকাশ 'পূজারিণী' কবিতাটি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় যেমন বিদ্রোহের তুমুল উচ্ছ্বাসের অন্তরালে রোমান্সের ফল্গুধারা প্রবাহিত, পূজারিণী কবিতায় তেমনি তীব্র রোমান্টিকতার (যার উৎপত্তি নারী প্রেমের আকর্ষণ বিকর্ষণে) অন্তরালে ধ্বনিত-হয়েছে বিদ্রোহের তিক্ত জ্বালাকর মনোভাব।

কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি ?
জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধক্ ধক্,
হাহাকার করতালি বাজা! জ্বালাতোর বিদ্রোহের রক্তশিখা
অনন্তপাবক!

আনতোর বহ্নি রথ বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান তোর পরশু ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যা পুরী।
রক্ত সুধা বিষ আন্ মরণের ধর টিপে টুঁটি!
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক কুটি কুটি। ৯

রোমান্টিক নজরুলের মানস পট ভূমিতে আছে নারী প্রেম। ব্যাথার দানের রোমান্টিক আবেগময় প্রেম-কাহিনী রচনায় পেছনেও নজরুলের প্রথম যৌবনের প্রেম অভিজ্ঞতা বর্তমান। সেই প্রসঙ্গ পূজারিণী কবিতায় ও চলে এসেছে। স্মৃতিচারী মন রোমান্টিক বিষাদাচ্ছন্ন বাতাবরণে স্থাপন, করে দেখেছে হারানো প্রেমকে। স্মরণ করেছে 'একদা প্রিয়া'র প্রথম পরিচয় স্মৃতি :

'মনে পড়ে—বসন্তের শেষে আসা
ম্লান মৌন আগমনী সেই নিশি।
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হল তব আঁখি চাওয়াসনে মিশি।
তখনো সরল সুখী আমি—ফোটেনি যৌবনমম
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি আঁখি উষাসম
আধ ঘুমে আধ জেগে তখনো কৈশোর,
জীবনের ফোটা ফোটা রাঙা নিশিভোর।' ১০

এই প্রেম-অভিজ্ঞতাকে কবি একে একে ব্যক্ত করেছেন একাধিক রমণী মধ্যে। এবং সকলে মিলে একই প্রেমিকা সত্তা অর্জন করেছে। সকলে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হয়ে এসেছে কবির কাছে। সকলেই 'দেবী', 'লোভী' 'এক পেয়ে সুখী নয় যাচে বহুজন'—এ জাতীয় ভাবনার পেছনে নিশ্চয়ই প্রেম—প্রহৃত পুরুষের সাময়িক উত্তেজনাই অভিব্যক্ত। নজরুলের প্রেম কবিতায় তাই দেখা যায় একদিকে তীব্র আসঙ্গ লিপ্সার সাথে সুতীব্র আক্রোশ। ব্যাথিত প্রাণের ঔদাস হাহাকারের সঙ্গে ধ্বংসকামী পৌরুষের জ্বালাকর অভিজ্ঞতা। ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা আর বঞ্চনা কাতর প্রেমিকের অসাধারণ দহন—একই সঙ্গে নজরুলের প্রেম কবিতায় বর্তমান।

অনন্ত অগস্ত্য তৃষাকুল বিশ্বমাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আর।
ভগবান! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণাহরা
প্রেম সিন্ধু অনাদি অপার
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার। ১১

কবির অন্তর্গত এক শাশ্বত প্রেমিক সত্তা—চির অতৃপ্ত ও অগস্ত্য তৃষ্ণাতুর—খুঁজে ফিরছে এক শক্তিময়ী সম্পূর্ণ নারীকে। যে নারী ডুবিয়ে রাখবে দুর্দান্ত কবি-প্রেমিক কে, তৃপ্ত করবে।

কেবল নজরুল নয়, বাংলা সাহিত্য থেকে এই মুহূর্তে আরো দুজন কবির ব্যক্তি জীবনের নায়িকা সন্ধান তুলণীয় ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। মাইকেল এবং সুধীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকেই জীবনে ও কাব্যে চেয়েছিলেন এমন এক সম্পূর্ণ প্রেমময়ীকে, যাকে বাস্তবের সীমানায় পাওয়া বস্তুতই দুষ্কর। অথচ তাঁদের পাওয়া নারীদের সত্তায় তাঁদের কাঙ্খিত একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্য প্রথমে দেখেই তাঁদের গ্রহণ করেছেন জীবনে। এবং পরবর্তী কালে রোমান্টিক প্রেম কল্পনার সাথে বাস্তব মানুষীর মিল পাওয়া অসম্ভব বলেই হতাশায়, অভিমানে প্রথম গৃহীত প্রিয়াদের বর্জন করে ফিরে গেছেন কেউ নতুনতর কাব্য সাধনায় (মাইকেল) কেউ জীবন দর্শনের নেতিবাদে (সুধীন্দ্রনাথ) কেউ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে (নজরুল) [বিয়ের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে বেশী করে জড়িয়ে পড়েছিলেন নজরুল—এটা ও একটা ভাববার মত খবর]

প্রমীলার মধ্যে বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘনাদ যেমন আশ্রয় পেয়ে শান্ত থাকতে পারে, মাইকেল ও কি চেয়েছিলেন তেমনি এক নারী, ব্যক্তি জীবনে? তেমন 'প্রমীলা'র বর্ণনা :

জগতের রক্ষা হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী
মদকল কাল হস্তী। যথা বারিধারা
নিবারে কানন বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কালফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখেবসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নর লোকে। ১২

এরূপ নারীই মাইকেলেরও ছিল কাঙ্খিতা। তাই ব্যর্থ কবিকে শেষ পর্যন্ত। 'আত্মবিলাপ' করতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমাকাঙ্খা ও মূর্তি পেতে চেয়েছিল এমন এক নারীতে যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন :

কি মায়াবলে ঊর্ণাজালে বেঁধেছ সুরবালিকা

মদস্রাবী ঈর্ষাপর সর্বনাশা কুজুরে? ১৩

নজরুল ও সেই 'মদস্রাবী ঈর্ষাপর সর্বনাশা কুজুর' সত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন দ্বার থেকে দ্বারে। অবহেলা পাওয়া প্রেমের তীব্র দাহন তাঁকে 'ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি' করেছে। নারীর প্রতি, তার প্রেমের প্রতি সবিস্ময় আকর্ষণে যেমন রোমান্টিকতার স্পর্শ তেমনি বিচ্ছেদ বেদনা, বিরহ যন্ত্রণার মধ্যেও আছে রোমান্টিক বিষাদের লক্ষণ। নজরুলের প্রেম কবিতায় রোমান্টিকতার এই উভয় বৈশিষ্ট্য—বাসনাময় বিস্ময় এবং অসাধারণ বিষাদ—বর্তমান। আলোচ্য পূজারিণী কবিতায় এই বিস্ময় ও বিষাদ, আকর্ষণ ও বিষাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর আছে অভিমান, গভীর—তীব্র—দুরন্ত অভিমান :

মোরে মনে পড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারো বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে করো মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ।
আর কভু আসিবেনা
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও পদ কোকনদ।
মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির স্বার্থপর লোভী,
অমর হইয়া আছে—রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি। ১৪

কেবল পূজারিণীতে নয়, নজরুলের প্রথম থেকে শেষ জীবনের (অবশ্য জীবনের বলতে শেষ দিককার ১৯৪১—৪২ পর্যন্ত লেখা লেখির কথাই বুঝতে হবে) সমস্ত প্রেম কবিতার মধ্যেই এই সুতীব্র অভিমান বর্তমান।

প্রিয়া যাকে আঘাত করেছে, করেছে প্রত্যাখ্যানে, গ্রহণ করেছে অন্য এক পুরুষকে সেই পরবধূর উদ্দেশ্যে কিন্তু ব্যথাতুর অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর নজরুলের রোমান্টিক প্রেমের এক আস্বাদ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। মানবিক অনুভূতির রক্তরাগে নজরুলের অধিকাংশ প্রেম কবিতা রঞ্জিত।

'দোলন চাঁপা'র অভিশাপ কবিতাটি তেমনি এক মানবিক অভিমান ক্ষুব্ধ প্রণয়ের রক্তরাগে লিপ্ত। কবিতাটি শ্রাবণ ১৩৩০ (১৯২৩ ইং) 'কল্লোলে'

ছাপা হয়েছিল। একদা-প্রিয়া এক নারী সম্প্রতি 'প্রেমিকের প্রতি অমনযোগিণী। ফলতঃ তীব্র অভিমানী প্রেমিকের মরণ বাসনা কবিতাটিতে এক বিষাদ ঘনিয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, এই বিষাদকে ঘনীভূত করেছে প্রাক্তন মিলনের স্মৃতি চারণ। কখনো আসন্ন বিরহিণীর অবচেতনে, মৃত প্রেমিকের 'স্মৃতির অত্যাচার' কবিতাটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে :

স্বপন ভেঙে নিশুতরাতে জাগবে হঠাৎ চমকে,
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় ওঠবে ও বুক চমকে
জাগবে হঠাৎ চমকে,
ভাববে বুঝি আমিই এসে
বসনু বুকের কোলটি ঘেঁসে,
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন
শূন্য শয্যা মিথ্যা স্বপন
বেদনাতে চোখ বুজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে। ১৫

অভিশাপ কবিতাটিতে ('অভিশাপের' ১ বছর বাদে রচিত) রবীন্দ্রনাথের পুরবী কাব্যের অপরিচিতা কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'অপরিচিতা'র শেষ স্তবক বারবার অভিশাপ' কবিতার অনুষঙ্গে মনে পড়ে :

তোমার ফাগুণ ওঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণচাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছা ভরা,
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন মালা গাঁথা
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা
সেদিন আমি আসবো নাতো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান। ১৬

তুলনীয় 'অভিশাপ' কবিতা :

ফুটবে আবার দোলন চাঁপ চৈতীরাতের চাঁদনী
আকাশ ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাঁদনী
চৈতীরাতের চাঁদনী। ১৭

আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন
তুলতে সে ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন
কাঁদবে কুটির অঙ্গন !

শিউলি ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে উঠবে কাঁদি
বুকের মালা করবে জ্বালা
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে ! ১৮

চিত্রকল্পগত সাদৃশ্য থাকলে ও দুই কবিতার দুই প্রেমিকের ভাবগত দূরত্ব কম নয়। প্রথমে মধুর বিদায়ী বিষণ্ণতা (অপরিচিতা) দ্বিতীয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় কিছুটা নিষ্ঠুর, তিক্ত অভিমান ক্ষুব্ধ বিষাদে ভরপুর একটি হৃদয় (অভিশাপ)।

অভিশাপ কবিতার শেষ স্তবকটি কবিতার মূল ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং সমগ্র কবিতায় যে মৃত্যুর বিষাদ, শিউলি ঢাকা সমাধির রিক্ততা, জোয়ার জলে নৌকা যাত্রার স্মৃতিচারণার ব্যথ-সংরাগ ছড়ানো ছিল, কবিতার শেষ স্তবকের বর্ণনা সে সব ভাবের বিরোধীতা করেছে:

আমার বুকের যে কাঁটা ঘা তোমার ব্যথা হানতো,
সেই আঘাত ই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত—
আসব তখন পান্থ !

হয়তো তখন আমার কোলে
সোহাগ লোভে পড়বে ঢলে,
আপনি সেদিন সেধে কেঁদে
চাপবে বুকে বহু বেঁধে,
চরণ চুমে পূজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে। ১৯

অনুতপ্ত নায়িকার কাছে মৃত্যুলোক থেকে নায়কের ফিরে আসা—তাকি নেহাৎ ই কল্পনায়, স্বপ্নে? কবিতার মধ্যে এর কোনো স্পষ্টতা নেই।

সুতীব্র আবেগময় আর একটি প্রেমের কবিতা 'অনামিকা'। অনামিকা কবিতাটি চট্টগ্রামে লেখা। তারিখ ২৭/৭/১৯২৬। কালিকলম পত্রিকার

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) এ 'অনামিকা' ও 'মাধবী প্রলাপ' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচক বলেন "এই কবিতা দুটিতে কবি ইন্দ্রিয়গত প্রেমের নূতন ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন।………বস্তুত এই রকম Sensuous কবিতা নজরুল সাহিত্যে ও বিরল। কবিতা দুটিতে নজরুলের প্রেম সর্ব সংস্কার মুক্ত, দেহ স্পর্শ মুখর, আবেগ প্রতপ্ত ও যৌবণ মদমত্ত"। ২০

কবিতা দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের কামনাময়তা ও বলিষ্ঠ জীবন সম্ভোগী মানসিকতা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম ব্যস্ততায়। শনি চক্রের প্রতিনিধি ও প্রধান সজনীকান্ত নজরুলের নামে রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ করে বসলেন। অভিযোগ নজরুল সাহিত্যে অশ্লীলতার বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। এই তথ্য দিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "সজনীকান্তরা কি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে, বিবাহের দু'বছরের মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুরাগ দীপ্ত কবিতা দুটি লেখার জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে যেদিন তাঁরা যে—রবীন্দ্রনাথের দরবারে নালিশ পেশ করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর বিবাহের (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) তিনি বছরের মধ্যে প্রকাশিত (নভেম্বর ১৮৮৬) কড়ি ও কোমল কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত—'যৌবন স্বপ্ন (আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ) স্তন শীর্ষক দুটি কবিতা, চুম্বন (অধরের কানে যেন অধরের ভাষা) বিবসন (ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল ! বাহু (কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা)……প্রভৃতি কবিতা লেখার অপরাধে তাঁর যৌবন কালীন সজনীকান্তদের কাব্যানুভূতি হীনতার দ্বারা সমভাবে ধিকৃত হয়েছিলেন" ২১ এবং হাতে ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির জবাব লেখা এড়িয়ে গিয়ে ছিলেন তা অনেকেই জানেন।

বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার 'বিস্মরণীয়' কবি মোহিতলাল ও এই দুই কবিতার জন্য আক্রমণ করেন কবিকে। এই আক্রমণের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল নিশ্চিত ভাবে নজরুল ও মোহিতলালের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি।

সাহিত্য সমালোচনার নামে ১৩৩৪ এর কার্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে মোহিতলাল নজরুলেরই সমালোচনা করলেন :

"কবির প্রেয়সী ই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা, তাহার কারণ তাঁহার কামতৃষ্ণা কোনো নাম নির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুন যোগ্য তাহাকেই পাত্র করিয়া তিনি তাঁহার কাম পরিবেশন করিতেছেন।

আবার নারী মাত্রেই তাঁহার সেই অনামিকা প্রেয়সী কেননা তাহাদের কোনো ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না। তাহারা সেই এক অভিন্ন রতি রসের বিভিন্ন পাত্র বইতো নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না—এবিষয়ে তিনি Pan মৈথুন ist" ২২

ভুলে গেলে চলবে না নজরুলের অনামিকা বা ঐ জাতীয় কবিতায় কামনার যে মুক্ত স্বীকৃতি আছে তার জন্য একক ভাবে নজরুল দায়ী নন। কল্লোল গোষ্ঠীরা যে দেহজ কামনাকে অঙ্গিকার করে গদ্যে পদ্যে রীতিমত আলোড়ন তুলতে চাইছিলেন, নজরুল সমকালীন বলে সেই ভাবনার শরিক হয়ে ছিলেন।২৩ অচিন্ত্যর রচনায় মিথুনা শক্তির প্রাবল্য দেখে রবীন্দ্রনাথ যে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং জীবন বোধের মধ্যে বলিষ্ঠতার উপস্থিতিতে নরওয়ে জর্মনী সাহিত্যে যে কাম বর্ণনা সহনীয় ও সাধারণ হয়ে আছে, আমাদের জীবনে সেই বলিষ্ঠতার অভাবই আমাদের কাম সাহিত্যকে রুগ্ন রিরংসুক দেহমনের অসুস্থ আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছে মাত্র—এরূপ সিদ্ধান্ত করেছিলেন। ২৪

নজরুলের অনামিকা কবিতায় সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। নজরুলের কণ্ঠে সেই বলিষ্ঠ জীবনের সুতীব্র লালসাময় কামনা ধ্বনিত হয়েছে। দেখা যায় কবির কণ্ঠস্বরে কিছু অতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস যুক্ত হয়েছে। পাঠক কে সচকিত করার মত কণ্ঠস্বর।

যদি অনুমান করা যায়, নতুন পত্রিকা কলিকলমকে জন সমক্ষে জাহির করার জন্যই নজরুলের এই উচ্চকিত কল ধ্বনি। তাহলে বোধ করি অন্যায় হয় না। কেননা নজরুলে ঐসময়ে এক আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কোথায় কি লিখছেন, শিক্ষিত তরুণ শুধু নয়, দুঁদে সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন, অতএব 'কালিকলমে' নজরুলের কবিতা, বিদ্রোহী কবির রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়, কামনা শক্তির 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাপার নিশ্চিত উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে পত্রিকা টিকে প্রচার করার। লক্ষণীয়, ঐ সংখ্যা (জৈষ্ঠ ১৩৩৩) কল্লোলে নজরুল লেখেন নি। আর খবর হিসেবে একথাও জেনে রাখা ভালো যে কাম-সাহিত্য রচনায় বুদ্ধদেবের হাতে খড়ি হচ্ছে ঐ সংখ্যা কল্লোলে। 'রজনী হল উতলা' লিখে।

যাই হোক, অনামিকার কাম-বাসনার মধ্যে পাশ্চাত্য রোমান্টিকদের Sensuous কবিতাবলীর প্রভাব সঙ্গত কারণে দেখেছেন সমালোচক। বলেছেন,

Ben Jonson, Robart Heric, Robart burns, John keats এর দেহার্তির সঙ্গে তুলনীয় এই কবিতা।[২৫]

বস্তুত বৈষ্ণব সাহিত্যে কামকলা বর্ণনায় যে উত্তরাধিকার গোবিন্দচন্দ্র দাসের অলজ্জ দেহ বাসনায় উনিশ শতকে আমরা দেখেছিলাম, তারই সাথে পাশ্চাত্য জীবন লিপ্সা যুক্ত হয়ে নজরুলকেও এই জাতীয় কামকাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। বলাবাহুল্য, এই ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য উপস্থিতি ও যদি কেউ আবিষ্কার করে বসেন তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অসীমা, অ-নামিকা, অনাগতা, চির দূরে থাকা, চির নাহি আমা, অরূপাকে সীমার মধ্যে পাবার ব্যাকুল বাসনাই 'অনামিকা' কবিতার মর্মকথা। আর এই খানেই তো রবীন্দ্রনাথ যাঁর ছন্দ বন্ধনে 'অধরা মাধুরীকে ধরবার সাধনাই মূলকথা। আর অনামিকায় জন্ম জন্মান্তরের প্রেম-সাধনার কথা শুনলেই পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রেম-কথা। তাই আমরা মনে করি, কালিকলমের পাতায় নজরুলের যে বাসনাময়তা তা ঐতিহ্য চ্যুত নয়। তবে ঐতিহ্য অতিক্রামী। সমকালীন (কল্লোল গোষ্ঠীর) কবিরা যে রাবীন্দ্রিক 'অনন্ত প্রেম' চেতনাকে অনন্ত কামতৃষ্ণায় বদলে নিতে চাইছিলেন অনামিকায় তার সুস্পষ্ট ছাপ। অতএব কবিতাটির বিরুদ্ধে মোহিতলালের আক্রমণ রীতিমত উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং সে উদ্দেশ্য যতটা কাব্যের শুদ্ধতা রক্ষার্থে তার চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রণোদিত। জ্যোতির্ময় ঘোষ লিখেছেন: "মোহিত-লাল যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই নজরুল বিরোধী শনি-বারের চিঠির সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন, তার প্রমাণ সজনীকান্তের আত্ম-স্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডেই পাওয়া যায়।"[২৬]

'অনামিকা' রোমান্টিক নজরুলের অনন্ত কামনাময় প্রেমের কাব্যরূপ। কবিতাটিতে নজরুলের সত্যানুরাগ ও জীবন লিপ্সা অসাধারণ ব্যাপ্তিলাভ করেছে। নজরুলের রোমান্টিক প্রণয়-কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু অনামিকা কবিতায় সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। কবির রোমান্টিক অভীপ্সা তাঁকে যুক্ত করে দিয়েছে। 'কোটি প্রেমিকের' সঙ্গে। কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যতর জীব জগতের রমণীয় অনুভবে তিনি আছেন—এ জাতীয় ভাবনায় তিনি লেখেন:

> যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুমভাঙা রাতে,
> রাত্রিজাগা তন্দ্রালাগা ঘুম পাওয়া প্রাতে,

সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা,
সকলের ঠোঁটে যেন হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!
তরুলতা পশু পাখি সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে।
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারারতি;
সকলের মাঝে আমি সকলের প্রেমে মোর গতি"।২৭

উদ্ধৃত শেষ দুই পংক্তি থেকে উপলব্ধ হয়, রতি সম্ভোগ কামী জীবকুল (মানুষ+মনুষ্যত্বের জীব) এবং প্রেম বঞ্চিত বিরহী সকলের মধ্যেই কবির উপস্থিতি। কারণ যে দেহহীন প্রিয়ার অনুধ্যানে তিনি নিরত, সে নারী কোনোদিন ধরার সীমানায় আসবে না। কেবল রমণীয় অনুভবটুকু রিরংসুক সত্তাকে জাগিয়ে রাখবে। এবং সে নারীকে তিনি পান চুম্বনের, আলিঙ্গনের সীমানায় তার সম্বন্ধে এক অব্যক্ত বেদনা—অতৃপ্ত বাসনা বলে ওঠে: নহে এসে নহে।' এই অ-স্তিমিত অ-বিরত প্রণয় এষণাই রোমান্টিক প্রণয়ের বৈশিষ্ট্য। কীটসের গ্রেসিয়ান অনত্রর সেই ছবির প্রেমিকের মত নজরুলও বলেন, ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগলয়ে! ব্যথা দেওয়া রানী মোর এলে নাকথা কওয়া হয়ে।'২৮

[প্রসঙ্গত মনে পড়ে, নজরুল কীটসের ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। একাধিক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (১) "আর মনে হচ্ছে আমিই যেন কীটস্। যে কোন ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়তো বা আমার ও বুকের চাপধরা রক্ত তেমনি করে কোনদিন শেষ ঝলক ওঠে আমায় বিয়ের বরের মত করে বাড়িয়ে দেবে।২৯

(১) কেবলি কীটস্‌কে স্বপ্নে দেখছি—তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন। পাথরের মত।৩০]

কবিতার শেষ অংশে কিছুটা নিষ্ঠুর ভাবে কবিকে বলতে শোনা যায়:

॥ প্রেম সত্য, প্রেম পাত্র বহু-অগনন
প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু,
বহুপাত্রে ঢেলে নেব সেই প্রেম—
সে সরাব লহু।"৩১

নিষ্ঠুর কিন্তু অমৃত নয়। আমাদের জৈবিক এষণা কিংবা বিশুদ্ধ প্রণয় উভয়তই এই নির্মমতা উপস্থিত। কোটি প্রেমিকের মাঝে যে প্রেমিক নিজেকে

আবিষ্কার করে, সে নিশ্চয়ই সেই একই প্রেমকে অজস্র প্রেমাধারে খুঁজে পায়। পৃথিবীর রীতিই এই। 'ভালোবাসা' কেই কেবল ভালোবাসি আমরা। বিশেষ কোনো নারী সেখানে গৌণ। প্রতিরূপে সেই অপরূপার আহ্বান।

নজরুলের প্রেম কবিতায় নারীর প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ আছে তার সাথে যুক্ত হয়েছে এক প্রকারের মর্ষকাম। যৌন মনস্তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যানুসারে এই অনুভূতি প্রেমের পূর্ণতার প্রকাশ। 'অনামিকা' কবিতার শেষ অংশে এই মর্ষকাম অনুভূতির ছায়া পড়েছে। তবে তার সাথে বিমূর্ত প্রিয়ার অনুভব যুক্ত হয়ে সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়েছে এক শোভন অশ্লীলতা।

অনির্দিষ্ট প্রণয় এষণার কবিতা 'অনামিকা'। বাঞ্ছিতা প্রিয়ার অপ্রাপ্তি কবিকে এই জাতীয় তৃপ্তিহীন রমণেচ্ছা ও রূপ বাসনায় নিয়ে গেছে :

বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে, এসে নহে।
কুহেলিকা কোথা তুমি ? দেখা পাব কবে ?
জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিংবা জন্ম লবে ?
কথা কও ; কও কথা প্রিয়া ;
হে আমার যুগে যুগে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া [অনামিকা/সঞ্চিতা/ পৃ ১৩৫] ৩২

'বলাকা' কাব্যের অ-নিকেত, অনির্দিষ্ট গতিশীল যে প্রেম জন্ম থেকে জন্মান্তরের পথে যাত্রী তারই ছোঁয়া অনামিকা কবিতায় অন্তর্লীন আছে বলে মনে হয়। তাছাড়া মুক্তক ছন্দের প্রভাব ও কবিতাটিতে বলাকা কাব্যের প্রভাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ৩৩ 'আর তৃষ্ণা জাগনিয়া' শব্দটিকে রক্ত করবীর বিশুর সেই গান—'দুখ জাগানিয়ার' অনুসঙ্গ স্মরণে আনে ?

নজরুলের শেষ দিককার প্রেমের কবিতায় লেগেছে নৈরাশ্য ও বিষাদের সুর এর পেছনে অনুমিত হয় ফজিলতুন্নেশার নির্মম প্রত্যাখ্যান ক্রিয়াশীল। অবশ্য এই প্রত্যাখ্যানের আঘাতে কবির রুদ্র বীণায় যে বেদন বেহাগ বেজেছে এজন্য সে মনস্বিনী ধন্য বাদার্হ্য আর কে জানে এই প্রত্যাখ্যানের তীব্রতাই ক্রমশ নজরুলকে বেশী করে সঙ্গীত ও অধ্যাত্ম জগতের দিকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা ? 'প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা বন্ধু পীড়ন সহ্য কর' ৩৪ —হাফিজের এই পরামর্শ তিনি ও কি মেনে নিয়েছিলেন !

যাই হোক, তাঁর শেষ দিককার, উল্লেখ্য প্রেমের কবিতাবলীর মধ্যে 'গোপন

প্রিয়া' 'গানের আড়াল, 'এ মোর অহংকার' 'রহস্যময়ী' এবং 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে—উৎকৃষ্ট। প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখতে হবে এই শেষ দিককার প্রেমের কবিতাগুলির সবটার মধ্যেই এককভাবে কেবল ফজিলতুন্নেশার উপস্থিতিই নেই। তাঁর পূর্বোক্ত বেদনা দাত্রীরা ও আছেন। নার্গিস কে চিঠিতে নজরুল লিখেছেন, "আমার চক্রবাক নামক কবিতা পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছো? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে"। ৩৫ আর দু একটি কবিতা তো ফজিলতুন্নেশার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেকারই সৃষ্টি। 'গোপন প্রিয়া' তেমনি একটি কবিতা।

'গোপন প্রিয়া' কবিতাটি চট্টগ্রামে লেখা। ২৮.৭.১৯২৬ কবিতাটির রচনাকাল। সিন্ধু হিন্দোল কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতায় ও লেগেছে এক অতৃপ্ত বাসনাময় প্রেমের উত্তাপ। এই সময়ে কবি চট্টগ্রামে ছিলেন সামসুন নাহার মাহমুদের বাড়ীতে। সেখানে নজরুলের দিন কাটানোর মোটামুটি পরিচয় এই রকম: সারাদিন হৈ হুল্লোড়ের মাঝে কাটিয়ে কবি মধ্যরাত্রে বাসায় ফিরতেন। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকত, থাকত পান আর কেটলি ভরা চা, আর টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত থাকত খাতা কলম। বলাবাহুল্য অলক্ষ্যে থেকে বেগম সামসুন নাহার সাহেবাই এগুলি গুছিয়ে রাখতেন। ৩৬ উদ্ধৃত অংশের 'অলক্ষে থেকে' কথাটি দরকারী। বিবাহিতা, বিদুষী এবং সংস্কৃতি মনস্ক এই নারী নজরুলের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর এবং ভাই (বাহারউদ্দীন) এর আগ্রহে নজরুল চট্টগ্রামে গিয়েও ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন-ঐ মহিলার সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি আলাপ হতে কি পর্দা প্রথায় আটকাতো? অন্তত তাই মনে হয়? এ প্রসঙ্গে নজরুলের এক চিঠি প্রামাণ্য: তুমি আমার সামনে আসতে পারনি বলে আমার কোনো রূপ কিছু মনে হয় নি। ৩৭

এ সম্পর্কে নাহারের রচনা:

চট্টগ্রাম ও কলকাতায় দীর্ঘ কাল কবির সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও মমতার সম্পর্ক সত্ত্বেও আমি কখনো তাঁর সামনে বেরুইনি" ৩৮ পরবর্তীকালে, মানে ১৯৪০ বা তার কাছাকাছি সময়ে নাহার নজরুলের সামনে বেরোন। তথ্য দিয়েছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। ৩৯ কিন্তু মনে রাখতে হবে নজরুলের অসুস্থ হতে তখন আর বেশী দেরী নেই।

এই যদি সত্য হয় তবে কবিতায় লেখা এই সব কথাগুলো একটা বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে:

নাম শোনা দুই বন্ধু মোরা হয়নি পরিচয়
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়। ৪০

বন্ধু তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও ৪১
ওগো আমার আড়াল থাকা ওগো স্বপন
তুমি আছ আমি আছি এইতো খুশি মোর, ৪২

সমগ্র কবিতার বক্তব্যে নয়; এই সব টুকরো আবেগগুলোর মধ্যে অন্তরাল বর্তিনী—'নাহার' কি প্রতিবিম্বিত? এরকম ঘটা অসম্ভব নয়। অথচ আবার বলতে হচ্ছে, সমগ্র কবিতাটিতে যে নারীর প্রসঙ্গ, যে বাসনাময় প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে তা সামসুন নাহারের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভাবিত। কিন্তু এসব টুকরো আবেগে নিশ্চয়ই নাহার এরই কিছুনা কিছু অবদান থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

'গোপন প্রিয়া' কবিতায় নজরুলের প্রেম—বাসনার একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে 'নাইবা পেলাম চেয়েগেলাম গেয়ে গেলাম গান, মনে রাখতে হবে নজরুলের অধিকাংশ প্রেম কবিতার সারকথা এই রোমান্টিক বাসনা বিস্তার এবং অপ্রাপ্তি জনিত মধুর যন্ত্রণা। এই দিক থেকে গোপন প্রিয়া কবিতাটি তাঁর অধিকাংশ প্রেম কবিতারই বক্তব্য বাহী।

'গানের আড়াল' চক্রবাক কাব্যের অন্তর্গত। ১৯২৯ এর দিকে 'চক্রবাক এর প্রকাশ কাল। কবিতাটির রচনার নির্দিষ্ট সঞ্চিতায় উল্লিখিত নেই। রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যের একটি কবিতায় আছে।

এ গান গুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি।
ক্ষতি কি তায় নাই চিনিলে সখি।
তবু তোমায় গাইতে হবে নাই তাহে সংশয়—
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়" ৪৩

আর নজরুলের গানের আড়াল কবিতায় পড়ি:

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান
এই টুকু শুধু রবে পরিচয় আর সব অবসান? ৪৪

কবিতা দুটির পারস্পরিক তুলনা সঙ্গত কারণে মনে আসে। গানের আড়াল

কবিতায় প্রেমিকের বেদনার মূলে রয়েছে প্রিয়ার অমনোযোগ। যার জন্য প্রিয়র গানের উৎসার, হৃদয়ের অন্তহীন উচ্ছ্বাস, সুরের সাধনা, যার বেদনার উৎস মূলে প্রিয়ার উৎসব বাসরের পটভূমি রচিত হচ্ছে—সেই কেবল বুঝলোনা প্রিয়ার হৃদয়। নজরুলের সব গান রচনার সময় লেখা নেই। কে জানে এই কবিতা রচনার খুব কাছাকাছি সময়ে তিনি লিখেছিলেন কিনা গানটি :

"আমায় নহে গো ভালোবাস তুমি
ভালোবাস মোর গান।……
তুমি বুঝিবে না আলো দিতে কত পোড়ে প্রদীপের প্রাণ।
যে কাঁটা লতার আঁখি জল হায় ফুল হয়ে ওঠে ফুটে,
ফুল নিয়ে তার দিয়েছো কি কভু শূন্য পত্র পুটে— ৪৫

গানের আড়াল কবিতায় লিখছেন :

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখোনা সে ফুল তুলে
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি
জানি, তারকাছে যাও তুমি তার গন্ধ সুষমা লাগি।
যে কাঁটা লতায় ফুটেছে সে ফুল, রক্তে ফাটিয়া পড়ি
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি—
দেখ নাই তারে। মিলন মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি। ৪৬

'এমোর অহংকার' কবিতায় শোনালেন স্বার্থপর প্রিয়ার জন্য স্বার্থহীন প্রেমিকের আত্ম সান্ত্বনার কথা। কবিতাটির রচনাকাল ২৬ চৈত্র ১৩৩৪। এই কবিতার প্রথম দুই পংক্তির সঙ্গে আশ্চর্য জনক ভাবে মিলে যায় মিস ফজিলতুন্নেশাকে লেখা নজরুলের চিঠি বক্তব্য : "এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, তোমায় এর উর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি, আমি তোমায় সৃষ্টি করব।" ৪৭ তুলনীয় কাব্যপংক্তিটি এই মুহূর্তে উদ্ধার যোগ্য :

"নাইবা পেলাম আমার গলায়
তোমার গলার হার
তোমায় আমি করব সৃজন—এ মোর অহংকার ৪৮

কবিতাটি যে মিস ফজিলতুন্নেশার প্রেম প্রত্যাখ্যাত মানসিকতা নিয়ে রচনা এ তথ্য দিয়েছেন সৈয়দ আলী আসরাফ তাঁর নজরুলজীবনে প্রেমের এক অধ্যায়

গ্রন্থে।[৪৯] প্রেম প্রত্যাখ্যাত এক পুরুষ এই কবিতার নায়ক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে নজরুল ইসলাম হতেই হবে এমন তথ্য প্রমাণের চেষ্টা অবান্তর। তবে এ কথা সত্য যে, এ ধরণের কবিতাগুলি ode জাতীয় রচনা হলেও হতে পারতো। কবি সচেতন ভাবে ব্যক্তি সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক করার চেষ্টাই করেন নি।

"তৃষ্ণা-ফোরাত কূলে কবে 'সাকিনা' সমা
এক লহমার হলে বধূ, হয়ে মনোরমা
মুহূর্তে সে কালের রেখা
আমার গানে রইল লেখা
চিরকালের তরে প্রিয়! মোর সে শুভক্ষণ
মরণ পারে দিল আমায় অনন্ত আজীবন।"[৫০]

[কাব্যাংশটি যতদূর মনে হয় ডি. এম লাইব্রেরীর বর্তমান (১৩৯১) সংস্করণের পূর্ববর্তী সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল। বর্তমান সংস্করণে এই অংশটি যুক্ত করে প্রকাশক কবি প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেছেন।]

এই কবিতাটিতেও পূরবীর পূর্বোক্ত 'অপরিচিতা' কবিতার ৫ম স্তবকের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ মোর অহংকারে যখন পড়ি:

আমার রচা গানে তোমায় সেই বেলা শেষে
এমনি সুরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে
রঙীন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন এ মোর অভিমান
যাচবে যারা তোমায় রচি তাদের তরে গান।[৫১]

আর রবীন্দ্রনাথে আছে:

'যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।'[৫২]

পার্থক্য এইটুকু শুধু যে, এ মোর অহংকারের নায়ক যে গান লিখেছে তা ব্যবহার করবে অ-মনোযোগিনী প্রিয়ার নতুন কোনো প্রেমিক। আর 'অপরিচিতা'র নায়ক বলে, তার প্রেমিকাই গাইবে তারই গান নতুন কোনো, অন্য কোন ভালোবাসার মানুষের জন্য।

নজরুলের প্রেম কবিতার নায়িকা স্বর্গীয় আইডিয়ার মধ্যে অবস্থিত নয়।

কবি তাকে মাটির পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ মেশা অনুভূতি লোকের প্রিয়া হিসেবে পেতে চান। দেবী হিসেবে নয়:

"ঊর্ধ্বে তোমায় তুমি দেবী
কি হবে মোর সে রূপ সেবি?
চাই না দেবীর দয়া যাচি প্রিয়ার আঁখি জল।"৫১

স্বপ্নময়ীকে বাস্তব লোকে পাবার জন্য সক্ষোভ জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়। অন্য কবিতায়ও:

তুমি বসি রবে ঊর্ধ্বে মহিমা শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ দেবী? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায়?৫৪

এই 'স্বপ্নময়ী' কবির জীবনে বাস্তবেরই এক নিষ্ঠুরা এবং এই নিষ্ঠুর বাস্তবের মৃন্ময়ী নারীকে (নিশ্চয়ই দেবীকে নয়) তিনি রোমান্টিক বলেই সাজাতে চেয়েছেন অপরূপা কল্পময়ী করে কখনো কখনো।

'আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
হাসে হাসুক গরব ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।'৫৫

প্রাসঙ্গিক ভাবে মনে পড়ে সুপরিচিত সেই গান—

মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী,
দেবো খোঁপায় তারার ফুল
...বিজলি জরির ফিতায় বাঁধিব
মেঘরঙা এলো চুল।৫৬

রূপময়ী প্রণয়িনীকে পাবার সীমানায় ধরা সম্ভব হয়নি বলেই কবির সৃষ্টিতে এতখানি আবেগ ও অভিমান, রূপময় স্তব ও অপরূপ বন্দনা!

"নাইবা ধরা দিলে আমায় ধরার আঙিনায়
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর সভায়
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হল মগন
কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাঁথছ ফুল হার।৫৭

এই বেদনাবোধ নজরুলের প্রেম-কবিতাকে অশ্রু ভারাতুর এবং বিষাদ গম্ভীর করে তোলে। বিশেষ করে, রচনাকালে এসব কবিতার যতখানি মারাত্মক বেদনার প্রতিক্রিয়া ছিল তার চেয়ে বহুগুণ হয়ে সে বেদনা বাজে, তাঁর অসুস্থতার, নির্বাক আড়ষ্টতার পর। যেন সেই নির্বাক অসুস্থ মানুষটি তাঁর আসন্ন পরিণামের পূর্বাভাস দিচ্ছেন এইসব প্রেম—অতৃপ্ত, অশান্ত কাব্য পংক্তিতে। এই অনুভূতির স্পষ্ট প্রমাণ—'তুমি মোরে ভুলিয়াছ, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা, সুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি, আড়াল কিংবা তীর্থ পথিক (যদিও এটি প্রেমের কবিতা নয়) প্রভৃতি কবিতা। এবং যদি আর বাঁশি না বাজে—অভিভাষণ। এইসব রচনার বিভিন্ন ছত্রে কবির আসন্ন ভীষণ নীরবতার, অবসর গ্রহণের ইশারা ধ্বনিত।

তুমি মোরে ভুলিয়াছ (রচনাকাল ২০.৩.২৮) কবিতাটি সম্বন্ধে নজরুল লিখছেন এক চিঠিতে, অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে—"ওর তুমি মোরে ভুলিয়াছ নামটা বদলে রহস্যময়ী করেছি"[৫৮] [নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ডে কিন্তু কবিতাটির নাম অপরিবর্তিত আছে। সম্পাদক এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন নি।] অন্য একটি চিঠিতে লিখছেন, "রহস্যময়ী কবিতাটি তুমি কোথায় পেলে সেদিন? যাক, যে রূপেই পাও, কেমন লেগেছে ওটা তোমার? এখানে সাহিত্যিক আসরে পড়েছিলাম ওটা, সকলেই ভয়ানক প্রশংসা করেছেন। বড় রথীরা বলেছেন, ঐটেই আমার লেখা শ্রেষ্ঠ Love poem।"[৫৯]

এই কবিতাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে এত আগ্রহ নিয়ে পত্র লেখার কারণ একটিই—এই কবিতার যিনি উদ্দিষ্টা রমনী সেই ফজিলতুন্নেশার সঙ্গে অধ্যাপক সাহেবের প্রায়ই নৈমিত্তিক যোগাযোগ। অতএব এসব কথা অন্যভাবে একটু, ফজিলতুন্নেশাকেই শোনানো। মোতাহার (নজরুল বলতেন (মতিহার) কে লেখা অনেক চিঠিই মূলত সেই নারীর উদ্দেশ্যে লেখা-ভাবতে ভালো লাগে, ঐসব পত্রের প্রাপক অধ্যাপক সাহেব এ মধুর খেলাটুকু বুঝতেন তো!

যাইহোক, দীর্ঘ এই কবিতাটিতে এক রহস্যময়ী বেদনাতুর প্রেয়সীকে আবিষ্কার করেছেন কবি। উপলব্ধি করেছেন যে নারী একদা গোধূলি ম্লান পরিবেশে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল, হয়তো বা দীর্ঘ রাত্রির প্রহর গুলোয় অনেক কাছাকাছি ছিল কিন্তু নিশি শেষে নিষ্ঠুরার মত বলে বসেছে এক মধুর যন্ত্রণার কথা: কোয়েল সেই গান গাওয়া পাখি আর কবি

উভয়েই এ নারীকে জ্বালায় অকারণে জ্বালায়। এই গোধূলি মন্দির পরিবেশ ও রাত্রির চন্দ্রদীপ জ্বলা মোহময় আবেষ্টনী কেটে গেলে দিনের তীব্র আলোর বাস্তবে ব্যথাতুর গীতিময় কবিকে চিনবে না সে।

"হয়তো দিবসে এলে নারিব চিনিতে
তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথা গীতে
কেবলি পাইবে হাসি সবার সুমুখে,
কাঁদিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে
মুছাব না আঁখিজল" এই সরল নাটক (Duplicity)-

টুকু নায়কের পক্ষে ছিল দুঃসহ নয় কেবল অপমানকরও বুঝি। এই রহস্যময়ীর ব্যবহার যদি নিছকই কবি কল্পনা না হয়, যদি বাস্তবের ব্যাপারে হয় তবে নিশ্চিত-ভাবে তা নজরুলের মত অকপট হৃদয়কে পীড়া দেবে। অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ১মা ঐ নারী কি স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দেওয়া কবি মানুষটির সঙ্গে সকলের সামনে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেছিলেন? রাতের মদির পরিবেশে যেখানে দেহ মনের সমস্ত আড়াল সরে গিয়েছিল হাজার দৃষ্টির আলোয় তা গোপন করতে চেয়েছিলেন সেই নারী? কে জানে? এ সব অনুমান মাত্র আমাদের। এ অনুমানের প্রথম সূত্র কবিতাটি। আর দ্বিতীয় সূত্র সম্ভবত বেশী নির্ভর যোগ্য সূত্র মোতাহার সাহেবকে লেখা নজরুলেরই চিঠির কয়েকটি অংশ:

আমার জীবনে এতবড় পরিবর্ত্তন এতবড় সৌভাগ্য আর আসেনি বন্ধু! যে বেদনার সাথীকে কবিতায়, কল্পনায় স্বপ্নে খুঁজে ফিরেছি রূপে রূপে যার স্ফুলিঙ্গ দেখেছি তাকে দেখেছি পেয়েছি ও বুকের বেদনায় চোখের জলে। কয় মুহূর্ত্তের দেখা, তারি মাঝে তাঁর কত বিরক্তি ভাজন হয়েছি, হয়তো বা কত অপরাধও করে ফেলেছি। পাওয়ার বেভুল আনন্দে যে আত্মবিস্মৃতি আমার ঘটেছে তা তাঁর ঘটেনি। কাজেই আমি কী করেছি না করেছি কী লিখেছি না লিখেছি, তা আমারও মনে নেই কোন দিন মনে পড়বেও না। কেবল মনে আছে তাঁকে তাঁর প্রতিটি গতিভঙ্গী হাসি কথা চলাফেরা সব। ঐ তিন দিনের দেখা তাঁকে আজো তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে। তেমনি হাসি, তেমনি কথা সব! ফিরে ফিরে মনে আসছে ঐ তিন দিনের মানুষটি। একবার নয় দুবার নয়, দিনে হাজার বার করে। আমার সকল চিন্তা কল্পনা হাসি গান ঘুম জাগরণ—সব কিছুতে দিবা রাত্রির জড়িয়ে আছে ঐ কয়েক

মুহূর্তের স্মৃতি। ঐ তিনটি দিন আমার কাছে অনন্ত কালের মত অক্ষয় হয়ে রইল। তার আঘাত বেদনা অশ্রু আমার শাশ্বত লোকের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে।

……… সুন্দর দেবতাও প্রথমে হয়ত দেখা দেন রুদ্র রূপে। সে আঘাত কি সকলে সইতে পারে?৬০ নজরুলই কি পেরেছিলেন? নাকি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের শিকার হতে হয়েছিল তাঁকেও। অঙ্কশাস্ত্রের বিদুষী রমনীর প্রত্যাখানে? আর একটি চিঠিতে সেই কমপ্লেক্স রীতিমত স্পষ্ট:

"আমার এতদিনে ভারি ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে। হয়তো চেষ্টা করলে বুঝতে পারি এখনো জিনিসটি। আমি আমার এক চেনা অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে পরশু অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলাম অঙ্ক নিয়ে। এম. এ, ক্লাসে কি অঙ্ক কষতে হয়—সব শুনলাম সুবোধ বালকের মত রীতিমত মন দিয়ে। শুনে তুমি অবাক হবে যে আমার এতে উৎসাহ বাড়ল বই কমলো না। কেন যেন এখন আর অত কঠিন হচ্ছেনা ও জিনিসটি। যদি আমি বি. এ টা পাশ করে রাখতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম যে এম. এ, তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে।

যদি ঢাকায় থাকতাম তা হলে তোমার কাছে আবার একবার যাদব চক্রবর্তীর Algebra নিয়ে বসে যেতাম–একেবারে $(a+b)^2$ থেকে শুরু করে। সত্যি ভাই মোতিহার, আমায় অঙ্ক শেখাবে? তাহলে ঢাকায় যেতে রাজী আছি। এমন অঙ্ক শিখিয়ে দিতে পারেনা কেউ, যাতে করে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট এম, একে হারিয়ে দিতে পারি এখন কেবলি মনে হচ্ছে কী ছাই করলাম কবিতা লিখে। তার চেয়ে অঙ্কের প্রফেসর হলে ঢের বেশী লাভবান হতে পারতাম।৬১

এই অতৃপ্তির অভিমান নিয়ে কবি লেখেন:

"হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
—এইবার আপনারে শূন্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরণের আগে। পাত্রভরি
ক'রে যাব সুন্দরের করে বিষপান।
তোমারে অমর করি করিব প্রয়ান
মরণের তীর্থ যাত্রী।

ওগো বন্ধু প্রিয়,

এমনি করিয়া ভুল দিয়া ভুলাইও
বারে বারে জন্মে জন্মে গ্রহে গ্রহান্তরে।
ও আঁখি আলোক যেন ভুল করে পড়ে
আমার আঁখির পরে। গোধূলি লগনে
ভুল করে হই বর তুমি হও কনে
ক্ষণিকের লীলা লাগি। ক্ষণিক চমকি'
অশ্রুর শ্রাবণ মেঘে হারাইও সখি।……
তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক।
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালি আলোক।
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ পাথর,
তোমার পরশ লাভ হইনু সুন্দর—
তুমি তাহা জানিলে না।
…সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জলিয়া ছিল—গিয়াছে নিভিয়া।৬২

'মরণের তীর্থ যাত্রী' কবি সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে কবিতায় ও একই কথা শোনালেন। সেই একই কাহিনী। কেবল এতে যুক্ত করেছেন বৈষ্ণবীয় প্রেম বৈচিত্রের অনুভব আর রাবীন্দ্রিক জন্মান্তরীণ প্রেম সম্বন্ধের প্রসঙ্গ।

"এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
কেন হুহু করে ওঠে তবু হিয়া
কি যেন কি নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা বিধুরা।৬৩

মোদের মাঝারে শত জনমের শতসে জলধি বহে
বারে বারে ডুবি বারে বারে ওঠি জন্ম মৃত্যু দহে
বারে বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড় বন্ধন যায় খুলি। ৬৪

আর তখন নতুন জন্মের ইশারায় কবির অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বেজে ওঠে:

"নব জীবনের বাসর দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে—
সেই সুখে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে।"৬৫

এই আসন্ন মৃত্যুর ছায়া নীরবতার কথা আরো কয়েকটি রচনায় আছে যেমন:

"তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ

আমার কণ্ঠ হইবে নীরব নিখিলকণ্ঠ মাঝে।"৬৬

আমি যাই সেই নিশীথিনী পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে ৬৭

কাব্য লোকের বাণী বিতানের আমি কেহ নহি আর ৬৮

আজ চলে যাই, এই পৃথিবীরে আর লাগে নাক ভাল ৬৯

যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে যাবেন।৭০

এই বিষাদ গম্ভীর ও মৃত্যু অধিক মরণের ছায়া ঘেরা দাহন নজরুলের প্রেম কবিতাগুলির পরিণতি। অসহ্য, উত্তপ্ত অথচ আকর্ষণীয়।

এই বিষাদ সঞ্চারিত হয়েছে নিসর্গকেন্দ্রিক কবিতাগুলিতেও। অনেক সময় কবি হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের আলম্বন বিভাব হয়েছে প্রকৃতি জগৎ। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবিকে যত না আকৃষ্ট করেছে তার চাইতে অধিক করেছে স্মৃতিচারী। কখনো বা কবি নিজের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের সমব্যথী, সঙ্গী আবিষ্কার করেন প্রকৃতির সমুদ্র, নদীতে। কখনো নিসর্গ জগতে খুঁজে পান তাঁর বিক্ষত হৃদয়ের জন্য প্রলেপ। নজরুলের কাব্যে প্রকৃতি প্রয়োগের এই-টিই পরিনত তথা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরের উল্লেখ্য কবিতাবলীর মধ্যে আছে: 'চৈতী হাওয়া,' 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি,' 'স্তব্ধ রাতে,' 'বাদলরাতের পাখী,' 'শীতের সিন্ধু,' 'কর্ণফুলি' এবং 'সিন্ধু' কবিতা।

এছাড়া আসঙ্গ লিপ্সাময় অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে নজরুলের কিছু নিসর্গ কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যে বহু নিন্দিত 'মাধবী প্রলাপ,' 'ফাল্গুনী', 'চাঁদনী রাতে,' 'রাখী বন্ধন, 'বাসন্তী' প্রভৃতি স্মরণীয়। আবার বলতে হচ্ছে, এই জাতীয় নিসর্গ কবিতা নজরুলের রোমান্টিক মনের এক বিশেষ দিকের প্রকাশ বটে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিকের নয়।

'চৈতী হাওয়া' কবিতাটি চৈত্র ১৩৩০-এ হুগলীতে রচিত, ছায়ানট কাব্যের অন্তর্গত এবং বর্তমানে ডি এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত সঞ্চিতার অন্তর্ভূক্ত।

নিশ্চিত ভাবে কবিতাটিতে বিরহী কবি হৃদয়ের স্মৃতিচারী মনন ক্রিয়াশীল। এছাড়া কবিতাটিতে আছে ইন্দ্রিয় ঘন নৈসর্গ জীবনের মিলন মন্দির প্রেক্ষাপটে একদা প্রিয়ার ব্যথিত স্মরণ। প্রকৃতির সূত্রে এসে জুটেছে সাঁওতালী জীবনের মুক্ত স্বাধীন দাম্পত্য ছবি। স্মৃতি সংরাগে রক্তিম, পুষ্ট ফলে ফুলে সুপুষ্ট শরীরিনী প্রিয়ার দেহের অনুষঙ্গ।

সবই তেমনি আছে। কিন্তু নেই কেবল সেই নারী সেই একদা প্রিয়া। যে নিসর্গ জীবনের অনুষঙ্গে মহুয়া ফুলের দেশে সঙ্গ-সুধা দান করেছিল কবিকে।

বইছে আবার চৈতী হাওয়া গুমরে ওঠে মন
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।[৭১]

পিয়াল বনায় পলাশ ফুলের গেলাস ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ···
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই
বলতে আমি এমনি চাই।
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ[৭২]

কামরাঙারা রাঙলোকের
পীড়ন পেতে ঐ-মুখের
স্মরণ ঝরে চিবুক তোমার বুকের তোমার ঠাম
জামরুল রস ফেটে পড়ে হায় কে দেবে দাম।[৭৩]

এই ইন্দ্রিয়ঘন আবেশময়তা হাহাকারে মন্মর হয়ে আসে
কোথায় তুমি কোথায় আমি যেতে দেখা সেই
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত—তোমার দেখা নেই।[৭৪]

এমন বিরহেও কিন্তু কবি প্রত্যাশাহীন নন। হয়তো কোনো একদিন সাক্ষাৎ হবে তার সাথে। সেদিন আর তার সাথে বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা নেই। "এক তরীতে যাবো মোরা আর না হারা গাঁ।" [৭৫]

কবিতার মানব-কথা এই টুকুই। কিন্তু এর চেয়ে লক্ষনীয়, কবিতাটির মধ্যে ব্যবহৃত প্রকৃতি জগতের চিত্রকল্পগুলি। এখানে এসেছে, জীবনানন্দের আগেই, গ্রামবাংলা ভীড় করে। এখানে যেমন আছে দীঘি, মহুলবন, চাঁপা, টগর, বেল চামেলী যুঁই স্থল কমল, বকুল যেমন আছে, সজনে ফুল, হিজল, পিয়াল, তেমনি আছে বুলবুলি কবুতর, তেমনি আছে মাছরাঙা, শালুক গাঙচিল। উত্তরসূরী হিসেবে ঐতিহ্যের অনুসরণ এবং পূর্বসূরী হিসেবে পরবর্তীদের জন্য অনেক উপাদান রেখে গেছেন কবিতার গ্রামজ দৃশ্য রচনায়। এক কথায় নজরুল যে রবীন্দ্রোত্তর এবং জীবনানন্দের পূর্ববর্তী তা সতর্ক পাঠক এই কবিতার বস্তুপুঞ্জ ও দৃশ্যাবলীর ব্যবহারে বুঝে নেবেন। আর নিশ্চয়ই অবাক হয়ে দেখবেন 'রূপসী বাংলার' 'কেশবতী নীল সন্ধ্যার রূপ দেখার আগে

চাঁদের—নিশ্চয়ই বাঁকা চাঁদের-ইহুদি ফুল পরা এক বিষাক্ত নীল সন্ধ্যাকে। যার মধ্যে হয়তো বা কিছুটা ভিন জাতীয় ইমেজ :

পাহাড় তলীর শালবনায়
বিষের মত নীল ঘনায়
শাঁপ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদ ইহুদী ফুল।৭৬

কবিতাটির অন্তর্গত সবচেয়ে রোমান্টিক প্রকৃতি চিত্র। জীবননান্দের সন্ধ্যা বর্ণনার পূর্ববর্তী। অনুসঙ্গ আনা অথচ অনন্য। আর নিশ্চয়ই আনুষঙ্গিক সে বর্ণনা রূপসী বাংলারই—'বাংলার নীল সন্ধ্যা কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে'।৭৭

'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'-কবিতাটি চক্রবাক কাব্যের। অধুনা ডি, এম, লাইবেরীর সঞ্চিতায়ও প্রাপ্তব্য। কবিতাটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী রচিত। এবং ১৩৩৫ চৈত্র কালিকলমে মুদ্রিত। অর্থাৎ কিনা ফজিলতুন্নেশার নিষ্ঠুরতার পরবর্তী অনুভূতি এ কবিতায় প্রাপ্তব্য।

কবিতাটি রচনার পরিবেশ ও পটভূমি দিয়েছেন আব্দুল আজীজ আল আমান সাহেব এই ভাবে :

"চট্টগ্রামে কবি যত বারই গেছেন প্রতিবারই তিনি উঠেছেন বাহার নাহারদের বাসায়। পাশে পুকুরের কিনারায় ছিল ন'টি সুপারিগাছ। প্রতিদিনই গাছগুলিকে দেখতেন কবি। চাঁদের আলোয় স্নাত হয়ে মৃদু হাওয়ায় যখন তাদের চিকন পাতাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠত খুব ভালো লাগত তাঁর। এমনিভাবে প্রতিদিন নিরালায় দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে এই নিশীথ জাগার সাথীদের সঙ্গে কবির যেন একটা আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।"৭৮

সামসুন নাহারকে ৪-২-২৯ এ লেখা একটা চিঠিতে লিখছেন নজরুল "আমার বন্ধু সিন্ধু কর্ণফুলির খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে গুবাক তরুর সারির খবর নিশ্চয়ই দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে। ওদের আঁখি পল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশী করে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি আর কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠি।"৭৯

কবিতাটি রচনার দিন ১০ বাদে লেখা এ চিঠি। সঙ্গত কারণে গুবাক তরুকে ঘিরে ভাবময় কিছু অনুষঙ্গ চিঠিতে এসে গেছে।

৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা দীর্ঘ পংক্তির সুদীর্ঘ। (ছোটো বড় পংক্তি

মিলিয়ে ১৯) একটি কবিতা বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি। বিষয় বস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু অনুভূতিতে গভীর ও অনবদ্য। জড়ে চেতনা সঞ্চার করার ব্যাপারটা কবিতার প্রশংসনীয় দিক নয়। মানে গুবাক তরুর প্রতি কবির প্রীতিটা কবিতার প্রশংসনীয় দিক নয়, গুবাক তরুকে অবলম্বন করে কবির বিরহী সত্তা সঙ্গ প্রকাশ করেছে সেইটাই দরকারী। কালিদাস তো বিরহী যক্ষ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "চেতনে অচেতনে দ্বৈত অবলোপ তাইতো কামুকের স্বাভাবিক।"৮০

নজরুলের এই কবিতায়ও মূলত এক বিরহী ও সঙ্গলিপ্সু নায়কের কণ্ঠস্বরই শ্রুত হয়:

রোমান্টিক নজরুল Part—1

"জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! তোমার শাখার পল্লব মর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল লেখা
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির ঝির মির মির যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলান তারির সাড়ীর আঁচল খানি।"৮১

এই সব তরুরাজি কবিকে স্মৃতি-মদির যন্ত্রণায় আবিষ্ট করেছে। বিদায়ী মুহূর্তে নিবিড় হয়েছে সঙ্গ সুখের স্মৃতি। কিন্তু কবিতাটির দ্বিতীয় স্তরে (আজি বিদায়ের আগে····· হোক বা না হোক দেখা-পর্যন্ত) এসে আমাদের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। কথাগুলি সত্যিকি গুবাক তরুকে উদ্দেশ্য করে বলা? নাকি আড়ালে থাকা অথচ কবির অনুরাগিনী সেই নারী নাহারকেই স্মরণে এসেছে এই সব একান্ত মানবিক অনুভূতি লোকের কথাগুলি লেখার সময়?" "জানি মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানা জানি বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণা পানি।"৮২ এসব বক্তব্যের সঙ্গে গাছ-পালার কথা মনে না আনলেই কবিতাটির আস্বাদন যোগ্যতা বেড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থের 'তাল গাছ' কবিতাটির মধ্যে যে গতি-তৃষ্ণা ও বন্ধন অসহিষ্ণুতা আছে, গুবাক তরুর সারি কবিতায়ও তার ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হয়।

"সারাদিন ঝর ঝর মন্থর
কাঁপে পাতা পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবেও।"৮৩

কিন্তু 'তালগাছের' আত্মবিস্মৃতির আনন্দকর সান্ত্বনার বদলে গুবাক তরুর বন্দীত্বের অসহায়ত্ব অনুভূত হয়েছে নজরুলের লেখায় :

অথবা এমনি করি
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারাদিন মান ভরি
মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন মরু।

তোমার দুঃখ তোমারেই যদি বন্ধু ব্যাথা না হানে
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যাথার দানে।"৮৪

বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা হলেও মানবিক অনুভূতির লগ্নতায় আশ্চর্য রোমান্টিকতা লাভ করেছে।

'স্তব্ধ রাতে' কবিতাটি নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড (হরফ) এর-অন্তর্গত। রচনার তারিখ নেই। প্রকৃতির কবিতা হিসেবে চিহ্নিত হলেও রাতের স্তব্ধতায় বিরহী চিত্তের অভিমান ঋদ্ধ মানসিকতার প্রকাশে সহায়তা করা ছাড়া এখানে রাতের আর কোনো ভূমিকা নেই।

'বাদল রাতের পাখি' কবিতায় (নজরুল রচনা সম্ভার হরফ ৩য় খণ্ড) বেদনা জাগানিয়া পাখির অন্তহীন, বিরামহীন 'বউ কথা কও' ডাক বর্ষার শেষ হলেও শেষ হয়নি। বর্ষায় তার গান যার সহমর্মিতা পেয়েছে আজ তার জীবনে ও প্রতিবেশে এসেছে শরৎ। মেঘ ভারাতুর আকাশ হেসেছে আলোকের ঝর্ণা ধারায়। তার কাছে বর্ষারাতের সঙ্গীহীন। 'বউ কথা কও' অবান্তর। তাই কবির অনুরোধ এই পাখি চলুক অন্য কোথাও যেখানে বেদনার বর্ষা এখনো ঝরে। সেখানে ফুলের আনন্দে আবৃত নয় বর্ষার পরিবেশ।

এই পাখি নিজেকই নিসর্গের অন্তর্গত পাখিমাত্র? নাকি কবি—গান গাওয়া বেদনার গান গাওয়া কবি স্বয়ং। একদা সহমর্মী কোনো বেদনাতুরের সঙ্গী হয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু তার জীবনে এসেছে শরতের সমারোহ। সেখানে আর বেদনার গানের কোনো মূল্য নেই। কবিকে দেখতে হবে, খুঁজতে হবে আর এক

পরিবেশ—যথা আজো ঝরে জল নাহিক ফুলের ফাঁকি কবিতার বক্তব্য এইটুকুই।

কবিতার নাম বাদল রাতের পাখি হলেও বাদল রাতের বর্ণনা এ কবিতায় নেই। এখানে এই নামটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে কেবল একটি ভাবনায়—এই শরতে বর্ষা রাতের গান গাওয়া পাখির কোনো মূল্য নেই। শরতের আলোকোজ্জল বর্ণনায় এই ভাবনার কালো মেঘ আবৃত।

এই কবিতার বাংলার শরৎকালের একটি পূর্ণরূপ দিয়েছেন নজরুল। পূর্ণরূপ বলতে এভাবেই বুঝতে হবে ব্যাপারটি সমগ্র নজরুল কাব্যে শরৎ কালের যে বিক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এখানে একটা স্তবকে সেগুলির প্রায় সব ক'টি ছবি দিয়ে দিয়েছেন কবি। আমরা সেই স্তবকটি উদ্ধৃত করতে চাই।

"আকাশের জল ভারাতুর আঁখি আজি হাসি উজ্জল ;
তেরছ চাইনি যাদু হানে আজ ভাবে তনু ঢল ঢল !
কমল দীঘিতে কমল মুখীরা অধরে হিঙ্গুল মাখে,
আলু থালু বেশে ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ আঁচল ঢাকে।
শিউলি তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে
শালুকের কুঁড়ি গুঁজিছে খোপায় আবেশে বিধূরা বধূ,
মুকুলি পুষ্প কুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু।৮৫

রবীন্দ্রনাথের শরৎ বর্ণনায় যে বিশুদ্ধি ও প্রশান্ত সারল্য, যে ইন্দ্রিয় জুড়ানো পটভূমি প্রায়শ দেখেছি, আমরা দেখতে অভ্যস্ত—নজরুলের এই বর্ণনায় তার উপস্থিতি নেই, অথচ খুব সম্ভাবনা ছিল। বরং দেখা গেছে এ ব্যাপারে নজরুল অনেক বেশী কালিদাস পন্থী। 'ঋতু সংহার' তাঁর পড়া ছিল কিনা জানিনা কিন্তু শরতের বর্ণনায় তিনি মদালস ইন্দ্রিয়ময়তার পরিচয় দিয়েছেন অনেক বেশী কালীদাসের মত করে। 'ঋতু সংহারের শরৎ বর্ণনার শ্লোকগুলি পাঠকের মনে সহজেই ছায়া ফেলে নজরুলের এ লেখা পড়লে।

চট্টগ্রামে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আর একটি কবিতা 'কর্ণফুলি'। নদী পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে নজরুলই বোধ হয় প্রথম কবি যার কবিতায় কর্ণফুলি নদীর কথা পেলাম।

'কর্ণফুলি' কবিতায় কবির চেতনাজুড়ে নদীর অস্তিত্ব এক নারীর অস্তিত্বে রূপান্তরিত। পর্বতের বুক ফাটা অশ্রুজল নদীর জল ধারার উৎস। এই নদীর জলের অতলতায় কবি আবিষ্কার করলেন তাঁর বিরহী পুরুষ হৃদয়ের বুকফাটা অশ্রুজলের অনুষঙ্গ :

"যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয়ারে ধরনীর কূলে কূলে
কাঁদিয়াছি যত সে অশ্রু কিগো তোমাতে উঠেছে দুলে ?৮৬

এই সূত্রে নদীর সকাশে শুরু হোলো কবির আত্ম অনুশোচনার লিরিক। কর্ণফুলি কবিতার কয়েকটি ছত্র নজরুল জীবনীর এক গোপন এবং অনুদ্‌ঘাটিত কক্ষের দ্বার খুলে দেয়। নজরুলের লেখায় আত্মবিদ্রোহী, বিরহী, ব্যথাতুর কবির অন্তরঙ্গ আলাপ অনেক শুনেছি আমরা। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের বস্তুতান্ত্রিক হিসেব সঠিক হতাশায় যার পরিণতি—এমন করে খতিয়ে দেখেননি কবি অন্য কোনো কবিতায়।

"জীবন ভরিয়া মিটায়েছি শুধু অপরের প্রয়োজন,
সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাসী মোর মন !
আপনার পানে ফিরে দেখি আজ চলিয়া গেছে সময়
যা হারাবার তা হারাইয়া গেছে, তাহা ফিরিবার নয়।
হারায়েছে সব, বাকী আছি আমি, শুধু সেই টুকু লয়ে
বাঁচিতে পারিনা শতচলি পথে তত উঠি বোঝা হয়ে।৮৭

এই আত্মসংবিতময় অনুভবের পরেও কিন্তু বেশ কিছুদিন সুস্থ ছিলেন নজরুল। কবিতাটি যদি গুবাক তরু রচনার সমকালীন হয়, মানে ১৯২৯ নাগাদ এর রচনা হয়। তবে এর পরেও নজরুল ১৩ বছরের মত সুস্থ ছিলেন। কিন্তু আত্মশোধনের আর অবকাশ ছিলনা বোধ করি। নিবেদিত প্রণয়ের নির্মম অপমান ক্রমশ তাঁকে কি করে তুলছিল বেদনাবিদ্ধ ও অসংলগ্ন ?

নজরুল চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন দু'বার। ১৯২৮ সালের জুলাইর দিকে ও ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে। 'সিন্ধু' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি ১ম বার চট্টগ্রাম যাত্রার ফসল। কবিতাটি 'সিন্দু হিন্দোল' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। সঞ্চিতায়-ও আছে। সঞ্চিতায় কবিতাটির রচনাকাল দেয়া হয়েছে এই ভাবে—সিন্ধু প্রথম তরঙ্গ ২৯-৭-১৯২৬, দ্বিতীয় তরঙ্গ ৩১-৭ ১৯২৬, এবং তৃতীয় তরঙ্গ ২-৮-২৬ অর্থাৎ সিন্ধুকে ঘিরে দীর্ঘ ৫ দিনের ভাবনা 'সিন্ধু' কবিতায় প্রাপ্তব্য। সিন্ধুই বুঝি একমাত্র কবিতা যা লিখতে নজরুল দীর্ঘতম সময় ব্যয় করেছেন। আসলে ভাবনার সূত্র সমুদ্র হলেও তিনটি কবিতা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। অন্তত নজরুল তাই মনে করতেন বলে আমাদের ধারণা। কেননা সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় নজরুল কালিকলমে এক সঙ্গে 'সিন্ধু'র দুটি কবিতা ছেপে ছিলেন। তিনটি নয়।৮৮

রোমান্টিক নজরুল Part—2

বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের সমুদ্র বিষয়ক কবিতা কিংবা সত্যেন দত্তের 'সিন্ধু তাণ্ডব' বা 'সমুদ্রাষ্টক' অথবা বায়রণের 'Child Harold's Pilgrimage' এর সমুদ্র বর্ণনা 'সিন্ধু' তরঙ্গগুলি রচনার সময় নজরুলের মনে সচেতন ভাবে উপস্থিত ছিল কিনা বুঝবার উপায় নেই। তবে রবীন্দ্রনাথে মগ্ন-চেতনা নজরুলের ভাবনায় বার বার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে রবীন্দ্র রচনার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। 'সিন্ধু' কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের কম করে ৪টি কাব্যগ্রন্থের সমুদ্র বিষয়ক ভাবনার টুকরো আবিষ্কার করা যেতে পারে। সমুদ্রের অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে কড়ি ও কোমলের, 'সমুদ্র' কবিতার কিংবা মানসীর 'সিন্ধু তরঙ্গ' এর অলক্ষ্য প্রভাব দেখা যেতে পারে। অন্তত 'সিন্ধু' কবিতার স্তর বিন্যাসে 'তরঙ্গ' ব্যবহার কি সিন্ধু তরঙ্গ কবিতা-নামকে স্মরণে আনে না? সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্র কল্পনায় সমুদ্র পৃথিবীর আদি জননী। 'হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার' ৮৯ নজরুলেও এরূপ ভাবনা দেখা যাবে। 'ধরা তব আদরিণী মেয়ে' ইত্যাদি অংশে। পূরবীর সমুদ্র কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। মনে হয়, (১৯২৪ অক্টোবরে লেখা) 'পূরবীর' কবিতাটির তিনটি স্তর বিন্যাসও বক্তব্যের দ্বারাই স্পষ্টত নজরুল পরিচালিত হয়েছিলেন 'সিন্ধু' কবিতা রচনায়। বোদলেয়ার পড়েছিলেন কিনা জানিনা নজরুল। কিন্তু বোদলেয়ারের মত নজরুলও সিন্ধুর মধ্যে মানবের তরঙ্গিত আত্মার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করেছেন।' ৯০ বিশেষ করে বুদ্ধদেবের অনুবাদে 'সিন্ধু ও মানব' কবিতার ১ম ও ৩য় স্তবকের ভাবনা নজরুলের সিন্ধু কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীন মানব রবে চিরকাল সিন্ধুর প্রেমিক!
তোমার দর্পণ সিন্ধু; অন্তহীন আন্দোলনে তার
প্রতিবিম্ব ছাখো তুমি তরঙ্গিত আপন আত্মার,
তার রিক্ত, তলহীন পাগলের তুমিও শরিক।

উভয়ে অপরিমান, অন্ধকার, সতর্ক তোমরা;
মানব কেউ কি তল খুঁজে পায় তোমার গহ্বরে?
হে সিন্ধু, কেউ কি জানে কত রত্ন তোমার অন্তরে?
উভয়ে অসূয়া পর, দাও নিজ রহস্যে পাহারা॥৯১

চির বিরহী ও বিদ্রোহী নজরুল সিন্ধুর সঙ্গে আবিষ্কার করেন আপন আত্মার সাযুজ্য।

"হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী।"৯২

কিংবা 'আমিও বিরহী বন্ধু, তুমিও বিরহী'৯৩

অথবা—

'এক জ্বালা, এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া'৯৪

সমুদ্র-প্রিয়া চাঁদের জন্য তার যে অন্তহীন প্রদাহ তার মধ্যে কবি নিজেরই ব্যথার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। তার ফলে কবিতাটি নিসর্গ পর্যায়ের কবিতা থেকে প্রেম কবিতায় উন্নীত হয়েছে। ১ম ও ২য় স্তবক জুড়ে সিন্ধুর এই বিরহী ও বিদ্রোহী সত্তারই রূপকথা।

সমুদ্র তৃতীয় তরঙ্গ কিছুটা ভিন্নধর্মী ভাবনাবাহী। এইজন্যই বুঝি কালি-কলমে ছাপতে দেবার সময় এই শেষ স্তবক বাদ রেখেছিলেন নজরুল। কিন্তু ৩য় তরঙ্গ কবির সিন্ধু ভাবনাকে সামগ্রিকতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অংশ রচনা করেই নজরুল তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার গতানুগতিকতা থেকে সরে আসতে পেরেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য অন্তত। সমালোচক বলেন, 'তৃতীয় তরঙ্গে সিন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা ঋষি উদাসীনবৎ। যেন সে প্রৌঢ় পিতা। এখানে সিন্ধুর বিশালতা, বৈচিত্র্য এবং পৃথিবীর প্রতি তার স্নেহ সেবা প্রকাশ পেয়েছে। সিন্ধুর প্রাকৃতিক ভূমিকাই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৃতীয় তরঙ্গে।"৯৫

কিন্তু মনে রাখতে হবে তা কিছুক্ষণের জন্য। পরক্ষণেই শুরু হয়েছে সেই বিরহী সত্তারই রূপায়ন। সেই সীমাহীন রিক্ত হাহাকারের গান, এবং সেই বিরহ বোধের তুলনায় কবির বিরহ বহু গুণিত হয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়ে যখন কবি বলেন :

"হে দুস্তর আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার—নাহি কূল,
শুধু স্বপ্ন ভুল।"৯৬

এইসব অংশ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আর সিন্ধু কবিতাকে নিছক প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা ভাবতে ভালো লাগে না। তখন মনে হয় এটি একটি রোমান্টিক মনেরই স্বপ্ন-সিন্ধু। সে সিন্ধু বিরহের। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা বিরহ পয়োধি কৃষ্ণ

বারিধির কূলে বসে ভেঙ্গে পড়েছিলেন হতাশায়, আর নজরুলের কবিতায় শুনলাম :

"বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরি ও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার
মধ্যে কাঁদে (বারিধির ?) বারিধার—
সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।"৯৭

অক্ষরবৃত্ত মুক্তকের হ্রস্বদীর্ঘ পংক্তি বিন্যাসে সিন্ধুর তরঙ্গ বিভঙ্গ ও শব্দিত দীর্ঘ লয় ব্যক্ত হয়েছে যথাযথ।

'শীতের সিন্ধু' কবিতাটিও চট্টগ্রামে লেখা। কবিতাটি বৈশাখ ১৩৩৬, কল্লোল ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বার চট্টগ্রামে গিয়ে এ কবিতাটি রচনা করেন কবি। কবিতাটির সূচনায় এ তথ্য আছে।

সিন্ধু সম্পর্কিত চিন্তায় নজরুলের ভাবনার দুই স্তর সুস্পষ্ট। ১ম স্তরে সিন্ধু "কানায় কানায় উদ্বেলিত; তার বুকে জাগে কল কল ঢেউ, অশ্রান্ত গর্জন, অনন্ত ক্রন্দন, সে তরঙ্গ বিভঙ্গে মত্ত হয়ে বেলাভূমিতে নিষ্ফল আক্রোশে রাত্রিদিন আছড়ে পড়ে, সে চঞ্চল, অস্থির, বিদ্রোহী। এ সিন্ধু যৌবনের প্রেমোন্মাদনার প্রতীক! উত্তর যৌবনের উদ্দামতাহীন সমুদ্র 'শীতের সিন্ধু'। এখানে বেদনা আছে, বিদ্রোহ নেই। আঘাত আছে প্রতিঘাত নেই। শীতের সিন্ধু বেদনায় নিস্তব্ধ নির্বাক! সিন্ধু ও নদীর প্রতীকী অর্থই নজরুলের কাছে মুখ্য ব্যাপার।"৯৮

"শীতের সিন্ধু" কবিতাটি রচনার সময় নিশ্চয়ই নজরুল জীবনের প্রণয় ঘটিত সর্বশেষ আঘাত প্রাপ্তি ঘটে গেছে। নজরুলের ব্যক্তি মানস রীতিমত নম্রবেদনায় আত্মসংকোচনে উন্মুখ। শীতের প্রশান্ত সমুদ্রে নিজের মনের এই অবস্থার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তিনি। অতীতের কামনা উচ্ছ্বাস বিদ্রোহের উত্তেজনা স্তিমিত হয়েছে। বুকে অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস, বিরহের জয়গান গেয়ে চলেছে কেবল।

'থর থর কাঁপে আজ শীতের বাতাস
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘ শ্বাস—
আজা তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে, হায়—
"ওরে মূঢ় যে যায় সে চির তরে যায়!

...   .

যে ফুল ফোটেনি ওরে তব উপবনে
পূবালি হাওয়ার শ্বাসে বরষা কাঁদনে
সে ফুল ফুটিবে নারে আজ শীত রাতে।"৯৯

সিন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ভঙ্গিতে কিন্তু আর সিন্ধুকে কবির হৃদয়ের প্রতিরূপ বলে মনে হয় না। বরং অভিমান পুঞ্জিত অনুভবে কবি সিন্ধুকেই বলে গেছেন সেই সব কথা যা বলতে চান তিনি তাঁর নিষ্ঠুরা প্রণয়িনীকে:

"হয়ত বসন্তে পুনঃ তব তীরে তীরে
ফুটিবে মঞ্জরী নব গুচ্ছ তব শিরে।
আসিবে নূতন পাখী শুনাইতে গীতি,
আসিবে না শুধু একা তব এ অতিথি,
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধুগো বিদায়।"১০০

নজরুলের দ্বিতীয় স্তরের প্রকৃতি কবিতা হিসেবে আমরা নির্বাচন করেছি লিপ্সাময়, ইন্দ্রিয়রাগ লিপ্ত প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা গুলিকে। এই অনুভূতিকে নজরুলের প্রকৃতি চেতনার একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে চাই। এর উৎসমূলে আছে আবহমান বাংলা কবিতার ধারা। হয়তো বা সংস্কৃত সাহিত্যের তথা কালিদাসেরই পরোক্ষ প্রভাব। আর ফার্সি সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। নজরুলের পূর্ববর্তী উনবিংশ শতকের দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় যে লাস্যময়ী প্রকৃতিকে দেখেছি আমরা নজরুলে তার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত।

নজরুলের প্রকৃতি বর্ণনায় মুখ্যভূমিকায় আছে মূলত দুটি ঋতু। শরৎ এবং বসন্ত। বর্ষা ও গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত কম জায়গা জুড়েছে নজরুল কবিতায়। বর্ষার মেঘ মদিরতায় বিরহ বোধ মাঝে মাঝে ব্যক্ত হলেও বোধ করি বর্ষা নজরুলের প্রিয় ঋতু নয়। নজরুল বসন্তেরই কবি। যৌবন রাগ, কামনাময় বাসন্তিক আবহ সৃষ্টিতে নজরুল চেষ্টিত। এইসব ক্ষেত্রে তিনি পারসিক ভূগোল, ফার্সি সাহিত্যর প্রসঙ্গ যেমন মনে রেখেছেন তেমনি মনে আছে তাঁর মধুর বৃন্দাবন। কৃষ্ণ রাধা, গোপিনী সখিরা এবং আবির, কুমকুম, ফাগ। শারদীয় পরিবেশ বর্ণনায় অবশ্য প্রায়শই তিনি একান্ত ভাবে বাঙালী। বাংলা দেশের ভূগোলেই

তাঁর চঙ্ক্রমণ। সৈন্ত বাহিনীতে থাকাকালীন ফার্সি থেকে অনুদিত একটি কবিতা সম্বন্ধে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন।১০১ তিনি বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে পারস্ত কবির পরিবেশের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন। নজরুলের প্রকৃতি লগ্ন গান ও কবিতায় সতর্ক পাঠক তাই পেয়ে যেতে পারেন একই সঙ্গে পারস্ত আরবদেশ কখনো বা বাংলার ভৌগোলিক অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতায় মিশে আছে, আবীর, কুস্কুম, ফাগ, সাকী সুরা, দ্রাক্ষা বিতান মদালসর তন্বী আর কিশোরী বালিকা সাহারা নীলনদ খর্জুর বীথি, লু-হাওয়া আবার মলয়পবণ, কর্ণফুলি শীতের সিন্ধু গুবাক তরুর শারি কখনো বা গোলাপ নার্গিস লালা আর কখনো শেফালি; জুই, শাপলা, কুমুদ আর সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত বর্ণনায় কবি ইন্দ্রিয়ময়তার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক সময়।

'মাধবী প্রলাপ' তেমনি এক ইন্দ্রিয় ময়তার কবিতা। একই সঙ্গে 'অনামিকা' কবিতাটিও কালিকলমে বেরিয়ে ছিল। একথা অনামিকা আলোচনার সময় বলা হয়েছে। কবিতা দুটি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য, "এই কবিতা দুটিতে কটি ইন্দ্রিয়গত প্রেমের নূতন ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছিল।...... বস্তুত এরকম Sensuors কবিতা নজরুল সাহিত্যে ও বিরল।১০২

বসন্তের আগমনে সমগ্র বনভূমি সুরত লীলায় ব্যাপৃত। জীর্ণ পাতা ঝরার চিত্রকল্প নির্মাণে শেলী তাঁর প্রখ্যাত কবিতা Ode to the west wind' এ ওঝার ভয়ে ভূতের পালাবার দৃশ্য দেখোছলেন। নজরুল দেখলেন সম্পূর্ণ আলাদা দৃশ্য। জীর্ণ পাতা ঝরার মধ্যে আবহমান কালের সাহিত্যে যে বিষন্নতা নবীনের সৃজন সম্ভাবনার ইশারা ধ্বনিত হয়েছে, নজরুল এখানে তারও কাছাকাছি নন। তিনি স্বতন্ত্র এবং অভিনব চিত্র উপহার দিলেন আমাদের ঃ

ঝরে ঝর ঝর মর মর বিদায় পাতা
ও কি বিরহিনী বনানীর ছিন্ন খাতা?
ওকি বসন্তে স্মরি স্মরি
সারাটি জীবন ধরি
শত অনুযোগ করি
লিখিয়া কত

আজ লজ্জায় ছিঁড়ে ফেলে লিপিসে যত লজ্জা। কেননা বসন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা হয়ে গেছে। বসন্ত দ্বারে আগত।

বসন্তের আগমনে চতুর্দিকে যে লাস্য লীলা চলেছে সে দৃশ্য বর্ণনা কতদিন

কবি অ-সংকোচে। মহুয়া ফুল বেহায়া সাঁওতালী ছুঁড়ি, বৃক্ষছায়া নৃত্যরতা শবরী, মল্লিকা, মালতী, বেলি, কাঠালিচাঁপা সমস্ত পুষ্পনারী যৌবন সম্ভারে আলুথালু। বাঁকা পলাশমুকুলে রাগ করা বন-বধূর আনত চোখ তার কামনার হর্ষে ডালিমের পুষ্টি, তার নার্গিসফুলি নয়নে বন-পুষ্পের রজস্বলা ভূষার সংবাদ। পিয়াল ফুলের চূর্ণ রেণুর ঝরে পড়ায় বনভূমির সঙ্গে বসন্তের মিলনের রতি পরিমল ঝরার দৃশ্য। ঘুঘুর ধূসর বর্ণে বনভূমির বিরহ কাতর কান্না, কোকিলের শিষ যেন মদনের বাণ হানাশব্দ।—এ দৃশ্যপট নির্মাণছাড়া কবিতাটির গুরুত্ব তেমন কিছু নেই।

এই ইন্দ্রিয়ময় বাসন্তিক পরিবেশ সৃষ্টিতে আশ্চর্য সহায়ক হয়েছে কবিতাটির ছন্দ স্পন্দন। অতি পর্ব যুক্ত হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রাবৃত্তের চলনে বন-ভূমির আবেগাকুল অনুভব সার্থক রূপ পেয়েছে।

'ফাল্গুনী' কবিতাটিও এই স্তরেরই কবিতা। কেবল পার্থক্য, মাধবী প্রলাপে শুধুমাত্র বনস্থলীর বর্ণনা। আর এখানে বনভূমির বসন্ত মানব মানবীর জীবনে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে তার খবরও যুক্ত হয়েছে।

'ফাল্গুনী' কবিতাটি হুগলিতে লেখা ১৩৩২ এ। কবিতাটি সিন্ধু হিন্দোল কাব্যের। সঞ্চিতায়ও প্রাপ্তব্য।

'ফাল্গুনী' ও 'মাধবী প্রলাপ' কবিতা সম্বন্ধে সমালোচক বলেন, 'বসন্তে যৌবন যন্ত্রণায় কাতরা। বিরহ পীড়িতা নারীর প্রগল্‌ভ উচ্চারণ ফাল্গুনী ও মাধবী প্রলাপ। দুটি কবিতাতেই দৈহিক কামনার দুর্দম প্রকাশ ঘটেছে।'১০৪

বসন্তের পুষ্প সম্ভার অসহ্য উত্তেজনা সঞ্চার করছে যুবতীর মনে। তার মনে কুল-মান হারাবার বিকলতা সৃষ্টি করেছে ফাল্গুনী-বিতান। এ পুষ্প পুরীতে সংযত থাকবে কে? চারিদিকে প্রভৃতিতে মিলনোৎসব বসন্তের। এরই মধ্যে এক অতৃপ্ত যৌবনা নারীর বেদনা কবিতাটির উপজীব্য।১০৫

'বাসন্তী' কবিতাটিও ফাল্গুনী এবং মাধবী প্রলাপের মত বসন্তের উৎসবলীলার কবিতা। এখানে বৃন্দাবনে শ্যাম ও রাধার মিলন লীলায় হোরী খেলার পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। উনবিংশ শতকের কবি দেবেন সেনও প্রকৃতিকে 'রূপসী রাধিকা সাজে' দেখেছিলেন। নজরুলে তার উত্তরাধিকার :

এলে শ্যাম বংশী-ধারী
গোপনে গোপ ঝিয়ারী
ফুল সব শ্যাম পিয়ারী
ভুলে যায় ছার গেহ বাস।১০৬

'চাঁদনী রাতে' কবিতায় ও চট্টগ্রামের পটভূমি ব্যবহৃত। এই কবিতা রচনার পরিবেশ-পটভূমি সম্বন্ধে শেখ দরবার আলম তথ্য দিয়েছেন, "ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর পরামর্শ ক্রমে কবি এক সন্ধ্যায় নির্বাচনী সফরে ট্রেনে জয়দেবপুর রওয়ানা হন। সে সময়ই জ্যোৎস্নারাতে রেলগাড়ির ইণ্টার ক্লাসের এক ছোট্টো কামরায় বসে কবি লেখেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা "জয়দেবপুরের পথে'' যা 'চাঁদনীরাতে শিরোনামে সিন্ধু হিন্দোলে-এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।"১০৭

"চাঁদনীরাতে' কবিতায় রাত্রি নীল প্রিয়া, আকাশ তার প্রিয়। উভয়ের মিলন বাসর কল্পিত হয়েছে কবিতাটিতে। এই মিলন বাসর বর্ণনায় এক ইন্দ্রিয় ময়তায় মগ্ন-মন কবিকে আবিষ্কার করা যায়।

রাখীবন্ধন কবিতাটিতে শরৎকালীন বর্ণনা। এই বর্ণনা দিতে গিয়েও কবি মধুর রসের লীলা দেখেছেন আকাশ ও ধরনীর সঙ্গে। নারীর অঙ্গাবরণ, কাঁচলি ও প্রসাধনের বস্তুসম্ভার হয়েছে নিসর্গ জগতের বস্তুপুঞ্জ।

বাংলার বাইরের অনুষঙ্গ মেশা কিছু নিসর্গ চিত্র নজরুল ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। হাফিজ-প্রিয়া শাখ-ই নবাত এর প্রসঙ্গ বর্ণনায় যখন কবি ইরাণের ভূগোল বিরহের রিক্ততার সাথে মিশিয়ে পরিবেশন করেন তখন বাংলা ভাষাতেও আমরা পাই একটা নতুন জগতের উপস্থিতি:

তেমনি আজো আঙুর খেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা
তূতীর বোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজো চিনির সিরা,
তেমনি আজো জাগে সাকী-পাত্র হাতে পানশালাতে—
তেমনি করে সুর্মা লেখা লেখে ডাগর নয়ন পাতে।
তেমনি যখন গুলজার হয় সরাবখানা মুশায়েরা
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড় ঘেরা,
গোধূলি সে লগ্ন আসে সন্ধ্যা আসে ডালিম ফুলী
ইরাণ মুলুক বিরাণ ঠেকে, নাই সেই গান সে বুলবুলি।১০৮

ডালিম ফুলি সন্ধ্যা, আঙুর খেতে বুলবুলিদের ওড়াওড়ি এ সব দৃশ্য অপরিচিত বলেই আমাদের মনে একটা রোমাণ্টিক আবেশ বিহ্বলতা সৃষ্টি করে।

আরবের ভূ-প্রকৃতিকে তুলে আনেন কবি ফাতেহা দোয়াজ দহম কবিতায়। সচেতন ভাবে নজরুল ইসলামী ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতাগুলিতে আরবীয় ভূখণ্ডের পটভূমি ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে বাংলা কাব্যে অন্য কোনো মুসলিম কবিও তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। প্রাসঙ্গিক ভাবে

নজরুলের বহু খ্যাত গান মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে…মনে পড়ে যেতে পারে। সেখানে ঈজিপ্সীয় সুরের মোহনীয়তা নয় কেবল, চিত্রকল্পের অভিনবত্ব ও আমাদের মনে সৃষ্টি করে এক অজেময় রোমান্টিক রহস্যময়তার স্বপ্ন লোক।

তবে একথা সত্য, নজরুলের প্রকৃতি চেতনায় গভীর কোনো জীবনদর্শন, যেমন রবীন্দ্রনাথে ছিল, ছায়া ফেলেনি। একা নজরুল নয়, সমকালের অন্য কোনো কবির মননে ও প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরীণ প্রেম-সম্পর্কের রাবীন্দ্রিক চেতনা যুক্ত হতে পারেনি। তবে নিরপেক্ষ ভাবে একথা মানতে হবে যে, রবীন্দ্রানুসারী কবিদের প্রকৃতি চিত্রের চাইতে নজরুল অনেক বেশী মৌলিক ও বিস্তৃত তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায়।

তথ্যপঞ্জী

১। নারী/সাম্যবাদী/সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী,

২। নূপুর অভিসার/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড,

৩। মুজফ্ফর আহম্মদ/কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা/ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী ১৯২৯/পৃঃ ১২৫

৪। মুজফফর আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৬৯

৫। মধুসূদন বসু/নজরুল কাব্য পরিচয়, ১৯৮৫ সন/পৃঃ ২০৭

৬। চিঠিপত্র/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়/হরফ পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪১৬

৭। চিঠিপত্র/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৭১

৮। মুজফফর আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৬৮

৯। পূজারিণী/সঞ্চিতা ; পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৪

১০। পূজারিণী/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১০

১১। পূজারিণী/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৫

১২। মেঘনাদ বধ/মাইকেল/সম্পাঃ কালীপদ সেন/এ মুখার্জী ১৯৬৭/৩য় সর্গ পৃঃ ৩৪

১৩। অর্কেষ্ট্রা/সুধীন্দ্র নাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ/দে'জ

১৪। পূজারিণী/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬

১৫। অভিশাপ/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৩

১৬। অপরিচিতা/পূরবী/১৩৬৩, পৃঃ ৯৮

১৭। অভিশাপ/সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৫

১৮। অভিশাপ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৪

১৯। অভিশাপ/ „ /পৃঃ ৩৬

২০। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত/নজরুল চরিত মানস/ভারতী লাইব্রেরী ১৩৬৩/ পৃঃ ২৬৬

২১। জ্যোতির্ময় ঘোষ / 'সাহিত্য বিতর্কের নেপথ্যে' প্রবন্ধ/মূল গ্রন্থ, সত্য যে কঠিন/গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী ১৩৬৩/পৃঃ ১৪৭

২২। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২৬৮—২৬৯

২৩। জীবেন্দ্র সিংহরায়/ কল্লোলের কাল। কথা শিল্প ১৩৬৩/ পৃঃ ১৫১—১৫৯

২৪। রবীন্দ্রনাথের পত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে/৩১ আশ্বিন ১৩৩৫/অচিন্ত্য কুমার রচনাবলী তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয় অংশ/গ্রন্থালয়, পৃঃ ৬৬১ ৬২

২৫। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬৭

২৬। জ্যোতির্ময় ঘোষ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৬০

২৭। অনামিকা/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৩৪

২৮। অনামিকা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৩৩

২৯। চিঠিপত্র/অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, হরফ ১৩৩৫/পৃঃ ৪৪৯

৩০। চিঠিপত্র/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৫২

৩১। অনামিকা/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৩৫—৩৬

৩২। আতাউর রহমান/নজরুল কাব্য সমীক্ষা/মুক্তধারা ভারতীয় সংস্করণ ১৩৩৫/পৃঃ ৮৫

৩৩। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩০৮

৩৪। রুবাইয়াৎ ই হাফিজ। অনুঃ নজরুল, নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২১

৩৫। চিঠিপত্র, নার্গিস আসার খানম লিখিত/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৭২

৩৬। আব্দুল আজীজ আল আমাম/নজরুল পরিক্রমা, ১৩৩৫/পৃঃ ৩৫০

৩৭। চিঠিপত্র, বেগম সামসুন নাহারকে লিখিত/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪১৫

৩৮। জ্যৈষ্ঠের ঝড়/অচিন্ত্য সেনগুপ্ত/আনন্দধারা ১৩৩৫ পৃঃ ২৩১ থেকে উদ্ধৃত।
৩৯। জ্যৈষ্ঠের ঝড়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৩১—৩২
৪০। গোপন প্রিয়া/সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২৮
৪১। গোপন প্রিয়া/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২৯
৪২। তদেব
৪৩। অপরিচিতা/পূরবী, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৯৭
৪৪। গানের আড়াল/সঞ্চিতা পূর্বোক্ত/পৃঃ ২২০
৪৫। নজরুল রচনা সম্ভার ১ম/হরফ ১৩৮৭/পৃঃ ২০
৪৬। গানের আড়াল/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২২০—২১
৪৭। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এর কাজী নজরুল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। এ. মুখার্জী
৪৮। এ মোর অহঙ্কার/সঞ্চিতা পূর্বোক্ত/পৃঃ ২০৯
৪৯। আতাউর রহমান/নজরুল কাব্যসমীক্ষা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১৩ পাদটীকা দ্রঃ
৫০। এ মোর অহংকার/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১০
৫১। এ মোর অহংকার/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১১
৫২। অপরিচিতা/পূরবী, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৯৭
৫৩। এ মোর অহংকার/সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১০
৫৪। তুমি মোরে ভুলিয়াছ/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, হরফ, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৮০
৫৫। এ মোর অহংকার/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১১
৫৬। নজরুল রচনা সম্ভার ১ম/হরফ
৫৭। এ মোর অহংকার/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১২
৫৮। চিঠিপত্র/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৫৮
৫৯। ঐ/পৃঃ ৪৬০
৬০। ঐ/পৃঃ ৪৫৫
৬১। ঐ/পৃঃ ৪৫৩
৬২। তুমি মোরে ভুলিয়াছ/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৮০
৬৩। সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে/ঐ/পৃঃ ৮২
৬৪। ঐ/পৃঃ ৮৩
৬৫। তদেব

৬৬। আড়াল/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৮৫

৬৭। সুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭১

৬৮। তীর্থ পথিক/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬৬

৬৯। আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, হরফ, পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬৮

৭০। যদি আর বাঁশী না বাজে/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, হরফ পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪০০

৭১। চৈতি হাওয়া/সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৩

৭২। ঐ/পৃঃ ৪৩

৭৩। ঐ / পৃঃ ৪৪

৭৪। ঐ / পৃঃ ৪৬

৭৫। ঐ / পৃঃ ৪৬

৭৬। ঐ / পৃঃ ৪৬

৭৭। রূপসী বাংলা/প্রকাশিত-অপ্রাকিশত পাণ্ডুলিপিও পাঠান্তর সংস্করণ। প্রতিক্ষণ ১৯৮৪/সনেটসংখ্যা ৫

৭৮। আজীজ আল আমান/নজরুল পরিক্রমা ২য়খণ্ড/পূর্বোক্ত পৃঃ ৩০—৩১

৭৯। চিঠিপত্র/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়,/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৬৩

৮০। কালিদাসের মেঘদূত/অনু-বুদ্ধদেব বসু-/এম.
পৃঃ ৭৯, শ্লোক সংখ্যা-৫

৮১। গুবাক তরুর সারি/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ২১৩

৮২। ঐ/পৃঃ ২১৪

৮৩। তালগাছ/সঞ্চয়িতা/পৃঃ ৫৭৮

৮৪। গুবাক তরুর সারি/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২১৫—১৬

৮৫। বাদল রাতেরপাখি/নজরুল রচনাসম্ভার ৩য় পূর্বোক্ত/পৃঃ ৭২

৮৬। কর্ণফুলি/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৭৩

৮৭। তদেব

৮৮। নজরুল কাব্য সমীক্ষা/আতাউর রহমান/পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৩
পাদটীকা দ্রঃ

৮৯। সমুদ্রের প্রতি/সঞ্চয়িতা/পৃঃ ১৫১

৯০। আতাউর রহমান/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৮৩
৯১। 'সিন্ধু ও মানব/বোদলেয়ার/অনুবাদ-বুদ্ধদেব বসু, বোদলেয়ার তাঁর কবিতা,
৯২। সিন্ধু/সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২১
৯৩। ঐ/পৃঃ ১২৫
৯৪। ঐ/পৃঃ ১২০
৯৫। আতাউর রহমান/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৮৩
৯৬। সিন্ধু/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২৭
৯৭। ঐ/পৃঃ ১২৭
৯৮। আতাউর রহমান/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৯৭-৯৮
৯৯। শীতের সিন্ধু/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৭৫
১০০। ঐ/ পৃঃ ৭৬
১০১। চিঠিপত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪০৪
১০২। ডঃ সুশীল কুমারগুপ্ত/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৭০
১০৩। মাধবী প্রলাপ / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৫১
১০৪। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ
১০৫। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত পৃঃ ২৭০
১০৬। বাসন্তী / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪৯
১০৭। শেখ দরবার আলম / 'ঢাকায় নজরুল' প্রবন্ধ / দেশ ৩১ আগষ্ট

১০৮। 'শাখ-ই-নবাত' নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪,

নজরুল কাব্যের রূপশৈলী :

কবিতার আঙ্গিক, myth প্রয়োগ, শব্দ, কাব্য দেহ সজ্জার অমনযোগ,

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে দীর্ঘ কবিতার আঙ্গিক মঙ্গলকাব্য বা জীবনী ধর্মী গ্রন্থে দেখা যাচ্ছিল তার ধারা, আরাকান রাজসভার বাংলা কাব্য চর্চার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল বোধকরি উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড কবিতার যুগ পর্যন্ত। অনেকে মনে করেন, এই সুদীর্ঘ কাব্য আঙ্গিক মূলত ইসলামী প্রভাব জাত মুসলমান আগমনের পর রাজসভাশ্রয়ী কাব্য চর্চায়, উর্দু সাহিত্যে যেমন সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়া সম্ভব। উক্ত ধারণাকে আরো সমর্থন করে এই খবর যে মুসলমান আগমনের আগে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ কিন্তু দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব আঙ্গিকের কবিতা।

ইসলামী কসিদা এবং মসনবী (যার বাংলা-প্রশংসা গাথা এবং কাহিনী কাব্য) র প্রভাবেই বুঝি বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল জাতীয় কাব্য গড়ে উঠেছিল যার উদ্দেশ্য দেব স্তুতি এবং কাহিনী ধর্মী কাব্য সৃষ্টি। তথ্য হিসেবে একথা চমকপ্রদ হলেও নিতান্ত অসম্ভব যে নয় তার প্রমান, উনবিংশ শতাব্দীতে নব্যশিক্ষিত হিন্দু সাহিত্যিকরা যখন গীত কবিতার আঙ্গিকে কাব্য চর্চার চেষ্টিত যার মূলে ইংরেজী Lyric এর প্রভাব রীতিমত ক্রিয়াশীল, তখন ইংরেজদের দ্বারা বিজিত ক্ষমতাচ্যুত বাংলার মুসলমান সমাজ গভীর বিক্ষোভে এই নতুন কাব্য আঙ্গিককে অবজ্ঞা করে দীর্ঘ কাব্য, গাথা ও কাহিনী রচনা করে চলছিলেন। তাঁরা ঐ আঙ্গিকে কাব্য রচনার মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করছেন বলে গর্ববোধ করছিলেন। এবং এটা চলে আসছিল নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত। নজরুল ইসলামের আগে পর্যন্ত মুসলমান সৃষ্ট সাহিত্যে ধর্মের নিখাদ সুর ও ইতিহাসের অকাট যুক্তিকে অবলম্বন করে, সমকালীন নব্য শিক্ষিত হিন্দু সাহিত্যকদের সাহিত্য আঙ্গিক উপেক্ষা করে মধ্যযুগীয় পয়ার ত্রিপদী আশ্রয়ী আখ্যান কাব্য, খণ্ড কাব্যের রীতি অবলম্বন লক্ষ্য করা যাবে।১

নজরুল তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি মুখী নিম্নমানের লেখার ধারা না মেনে যে আধুনিক কাব্য আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন এজন্য অনেকে নজরুলের এই কাব্য সৃষ্টি প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাতে পারেননি। নজরুলকে কেউ কেউ

পরামর্শও দিয়ে বসেছিলেন। এই পরামর্শের জবাবে নজরুল দীর্ঘ এক পত্রও লিখেছিলেন। আমরা তার অংশ বিশেষ এইসূত্রে উদ্ধার করতে চাই :

"আপনার 'মুসলিম সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সকল জাতিরই হবে।······ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে কিন্তু শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন্ ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি : গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিও স্বীকার করিই যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয়, তাঁরাও স্বীকার করেন, ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন মহাকাব্যও সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। ওঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান তা আমি বুঝতে পারি কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখানো—

আল্লা আল্লা বলবে ভাই নবীকর সার।
মাজা দুলিয়ে পরিয়ে যাব ভব নদী পার॥

রীতিমত কাব্য। বুঝাবার কোনো কষ্ট হয়না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেয়া হল মাজা ও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল। যাক বাঁচা গেল কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভব নদীর এপারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে তারা বলে মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বইজন—তারা বলে কমলবন টমলবন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয় সেও ভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভব নদীর পার ঘাটায় লাগাও নৌকা। এ অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি হুমুতুল ইসলাম লিখব না সত্যকার কাব্য লিখব?[২]

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি থেকে কাব্য কায়া নির্মানে নজরুলের সামনেকার বাধা এবং

তাকে অতিক্রম করার মত নজরুলের দুঃসাহসী প্রয়াস লক্ষ্যনীয়। রবীন্দ্রনাথকে চোখের সামনে দেখে পাঠ করে, তাঁর মোহনীয় আকর্ষণে মুগ্ধ ও অনুসৃত না হয়ে তৎকালের কোনো রুচিবান শিল্পীর উপায় ছিল না। আর নজরুল তো আবাল্য রবীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠক ছিলেন। অতএব যাঁর কাছে মহাকাব্য কালগত অভাব্য দুর্ঘটনায় কণায় কণায় বিকীর্ণ তাঁরই কাব্য আঙ্গিকের অনুশীলন চর্চা ও অনুকরণ নজরুলেও ছিল অবধারিত। ফলত নজরুল কাব্য চেষ্টায় গীতি কবিতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

কিন্তু একথা অমোঘ সত্য যে, যে নিটোল সংক্ষিপ্ত, গীতি কবিতার অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য তা আবেগান্দোলিত নজরুলের পক্ষে ছিল আয়ত্বাতীত। যে, আত্মসংযম ব্যক্তিজীবন ও শিল্প জীবনকে সুমিতি ও সৌষম্যদান করতে পারতো, ব্যক্তিগত ভাবে নজরুল ছিলেন তার থেকে দূরবর্তী। ফলে দুর্বার আবেগ এবং বক্তব্যের অকারণ দৈর্ঘ্য। তাঁর গীতি কবিতাগুলিকে প্রানোত্তাপে কবোষ্ণ ও কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি রাগে লিপ্ত করলে ও আকারগত সংহতির অভাবে সে সব রচনা প্রায়শই ক্লান্তিকর হয়েছে। 'বিদ্রোহী' 'সিন্ধু' 'অনামিক.' 'চৈতী হওয়া', 'অভিশাপ' 'ফাল্গুনী' 'তুমিমোরে ভুলিয়াছ.' 'সহিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' প্রভৃতি গীতি কবিতা এই মুহূর্তে স্মরণীয়। যেগুলি গীতি কবিতা হিসেবে নজরুলের তুরীয় শক্তি ও তীব্র ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আকারগত সংহতি ও সংযমের অভাব এজাতীয় রচনাকে তাদের ইপ্সিত শিল্প মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।

কবিতার কায়া গঠনে তথা স্তবক নির্মাণে নজরুল কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সন্ধানী হলেও সাধারণ ভাবে তিনি ক্লান্তিকর, একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়েছেন। চটুল ভাবাবলম্বী কবিতার ক্ষেত্রে মূলত তিনি স্তবক নির্মাণে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম। 'ফাল্গুনী' 'মাধবী প্রলাপ' এবং 'ঝিঙেফুল' পেয়েছে ছন্দগত ও ভাব সম্মত প্রশংসনীয় অবয়ব। 'সিন্ধু' 'অনামিকা' 'ফাতেহা দোয়াজ দহম' এমন কি 'বিদ্রোহীর' আকার ও একপ্রকার মেনে নেয়া যায়। উল্লেখ্য অবশিষ্ট কবিতাগুলির অবয়ব সম্বন্ধে নজরুল আর একটু চিন্তিত হলে বুঝি ভালো হত।

মাত্রাবৃত্ত তাঁর প্রিয় ছন্দ। এই ছন্দের একটানা তথা দীর্ঘ পংক্তিই প্রায়শ তাঁর কবিতায় প্রাপ্তব্য। মনে হয় অক্ষর বৃত্তের পংক্তি ও মাত্রাবৃত্তের পর্ব একত্রে তাঁর অধিকাংশ কবিতার একটা একটানা, বৈচিত্র্যহীন দৈর্ঘ্য

সম্পাদন করেছে। 'চৈতী হাওয়া', বা 'অভিশাপ' কবিতার ক্ষেত্রে ও পংক্তির স্তবকের মধ্যবর্তী দুই পংক্তিকে তুলনামূলক ভাবে হ্রস্ব আঙ্গিকে সাজানোতে স্তবক পাঠে একটি আচমকা দোলন কিছুক্ষণ আমাদের বিহ্বল করলেও কবিতার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে, সারাক্ষণ ঐরূপ পাঠ আবৃত্তিকার এবং শ্রোতাকে এক-ঘেয়েমীতে ভোগায় এটা অস্বীকার করা অসম্ভব।

আবেগবান কবিতার ক্ষেত্রে অতিপর্বের ব্যবহার ফলদায়ক। এবং নজরুল তাঁর অধিকাংশ উত্তেজক কবিতায় দক্ষতার সঙ্গে এই অতিপর্ব ব্যবহার করে কবিতার আঙ্গিকে একটু নবীনত্ব এনেছেন। 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'বিদ্রোহী', 'ফাল্গুনী', 'ফাতেহা দোয়াজ দহম', 'ছাত্রদলের গান' প্রভৃতি কবিতা অতিপর্বের অপর্যাপ্ত ব্যবহারে আবেগময়তাকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে অক্ষর বৃত্তের দীর্ঘ চলন, তাঁর কবি-স্বভাবের পক্ষে অনুকূল ছিল না বলেই নজরুল, এই ছন্দের সাহায্যে তাঁর কবিতা বাঁধতে উৎসাহী ছিলেন না তেমন। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের উপর নির্ভর করে তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন। 'দারিদ্র্য', 'শিখা', 'অনামিকা', 'ঝড়', 'মুক্ত পিঞ্জর' প্রভৃতি কবিতায় অক্ষরবৃত্ত এবং 'বলাকার' মুক্তকের প্রয়োগ ঐসব কবিতার অবয়বে শিল্প-রূপ এনেছে।৩

'কামালপাশা' কবিতায় মুক্তস্বরবৃত্তের দুর্দান্ত প্রয়োগ আমাদের সপ্রশংস বিস্ময় দাবী করে। কামালপাশা, বক্তব্যে, ছন্দে ও কবিতার আঙ্গিক বিন্যাসে অনবদ্য সৃষ্টি। যে গদ্য ছন্দকে নজরুল বিদ্রূপ করতেন৪ কামাল পাশার ভূমিকায় অজান্তেই তিনি তাঁর সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কামাল পাশায় এই অপূর্ব গদ্য প্রয়োগ তাঁর কবি জীবনের প্রথম দিকেরই ব্যাপার। অথচ এই নিয়ে আদৌ চিন্তা ও চর্চা করেননি তিনি। এটা তাঁর এবং তাঁর পাঠকের পক্ষে সমান দুঃখকর।

পরীক্ষামূলকভাবে, আরবী ছন্দাবলী কিংবা সংস্কৃতের দু'একটি ছন্দরূপে স্তবক বিন্যাস নজরুল করেছেন। ঋণ স্বীকার করেই, তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণের স্ফূর্তি লক্ষ্যণীয় নয় বলেই সেই সব কাব্যরূপ আমাদের তৃপ্ত করেনি।

মিথ প্রয়োগ

কাব্য রচনায় মিথ প্রয়োগ একটি বিদগ্ধ রীতি বলেই সবদেশে ও কালে স্বীকৃত। "পুরাণ বা মিথ একটি চেতনা, যা মানুষের কল্পনা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের সঙ্গে জড়িত। এতে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের আদর্শ—সব মিলিয়ে এমন একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়েছে, কল্পনা যেখানে বস্তুভিত্তিক এবং প্রত্যয় গ্রাহ্য হতে পারে।"[৫]

বাংলা কাব্য ধারায় মিথের সচেতন প্রয়োগ মাইকেলেই নিশ্চিত ভাবে প্রথম। রবীন্দ্রনাথের হাতে এর প্রয়োগ আরো বেশী মাত্রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাৎপর্যবাহী। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে মিথ প্রয়োগে রীতিমত বিচক্ষণ এবং সাধারণ পাঠকের ঈর্ষণীয় দূরত্বে অবস্থিত। বুদ্ধদেব এবং সুধীন দত্তের নাম ওপ্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার।

মিথ প্রয়োগে পুরাতন ঘটনা প্রসঙ্গের যুগগত নতুন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই সবচেয়ে বড় শর্ত। কবির সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর অতীত পুরাণের প্রসঙ্গকে আরোপ করে কবি যখন তাঁর বক্তব্যকে তাৎপর্য খণ্ডিত ও যুক্তি গ্রাহ্য করে তোলেন, তখনই তা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথের পর এবং অবশ্যই বিষ্ণুদের আগে এ ব্যাপারে উল্লেখ্য কবি-প্রতিভা নজরুল যিনি তাঁর কাব্যে মিথ ব্যাপারটির প্রয়োগে গভীরভাবে ভাবিত। নজরুল তাঁর বক্তব্যের স্ফুটতা ও অধিকতর জনমুখীতাদানের উদ্দেশ্যে মিথাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে দেশ বিদেশের পুরাণ প্রসঙ্গের বিস্ময়কর ব্যবহার ঘটেছে তাঁর কাব্যে। হিন্দু এবং মুসলমান ঐতিহ্য থেকে তিনি মিথ সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ করেছেন গ্রীক ও বাইবেলীয় পুরাণ-প্রসঙ্গ।

সমাজে শ্রেণী সচেনতা সৃষ্টির জন্য অত্যাচার, অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য মিথের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ এব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তাঁকে। সর্বহারা কাব্যের কৃষকের গান কবিতায় অত্যাচারী শোষক, রাবণের মত মাঠের হালের ফলায় যে সীতা রূপ শস্য ওঠে তাকে হরণ করছে। রামায়ণের সীতা হরণের প্রসঙ্গকে নিজের ভাবনার প্রকাশে সরাসরি ব্যবহার করেছেন নজরুল।

ধ্বংসের দেবতা শিবকে বারবার তাঁর কবিতায়, 'পিনাকপাণি', 'প্রলয়-

ঈশান' হিসেবে দেখি। ছিন্ন মস্তা চণ্ডীর কথা তিনি তুলে আনেন সহজে। অত্যাচারী শক্তিকে 'কংস' হিসেবে ভাবতে চান কবি। কখনো ইসলামিক ঐতিহ্যে খুঁজে পান এই গর্বোদ্ধত, দুর্বিনীত শক্তির প্রতিরূপ, শয়তান ফেরাউন, নমরুদ এদের কথা বলতে হয় কবিকে অত্যাচারীর স্বরূপকে অতীতের সাথে মিলিয়ে যাতে জনগণ সহজে উপলব্ধি করতে পারেন।" পক্ষান্তরে মুসা, ঈশা, ইব্রাহিম, মোহম্মদ প্রভৃতি ন্যায় সত্যের প্রতীক। ঐতিহাসিক চরিত্র এজিদ এবং পৌরাণিক চরিত্র রাবণ উভয়ে অত্যাচারী' শক্তির প্রতীক রূপে বারবার তাঁর কাব্যে এসেছে। ভারতীয় পুরাণের 'সব্যসাচী' এবং ইসলামী ইতিহাসের খালেদ তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ যোদ্ধা। এইসব পুরাণকে তিনি যুগের আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত করেছেন বলেই তারা সমাদৃত হয়েছে।"৭

এই সূত্রে আরও একটি ব্যাপার নজরে আসে খুব সহজে, সমন্বয়ী মনোভাবে নজরুল হিন্দু এবং মুসলিম ঐতিহ্যের মিথ যেমন অবিরল ব্যবহার করেন, তেমনি ব্যবহার করে থাকেন পাশাপাশি একই ভাবের দুই ঐতিহ্যর মিথ। অর্থাৎ এক এক জোড়া মিথের একটি হিন্দু অন্যটি মুসলমান ঐতিহ্যভুক্ত। কবি ইচ্ছে করে মিথ দুটিকে একটি বাক্যে রেখে দিয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় এ ব্যাপারটি খুব বেশী ঘটেছে। আমরা দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করতে পারি:

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার,

তাজি বোররাক আর উচ্চৈশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত হ্রেসা হেঁকে চলে।

ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া,

এই সব ক্ষেত্রে নজরুল ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন ভাবনার দিক থেকে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় গ্রীক পুরাণের 'আরফিয়াসের বাঁশরী'ও কবি ব্যবহার করেছেন।

কেবল বিদ্রোহাত্মক কবিতা নয়, প্রেম প্রসঙ্গে, নিতান্ত রোমান্টিক অনুভবের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যানুসরণ নজরুলের স্বভাব ধর্ম। এক্ষেত্রেও শকুন্তলা, সতী, উমা, শ্যাম-রাধা, দময়ন্তী, মহাশ্বেতা, কামরতি প্রভৃতি হিন্দু ঐতিহ্যের

সাথে ইসলামিক ঐতিহ্যের লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ, মমতাজ নুরজাহানকেও চিত্রিত করেন কবি। এক অর্থে মিথ প্রয়োগে নজরুল একটা পূর্ণতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। হিন্দু মুসলমানের মিলন-প্রয়াস যা তাঁর ব্যক্তি জীবনের একটা ধর্ম ছিল—আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ্য করি—তা তাঁর কাব্য-প্রয়াসের মধ্যেও অনবদ্য ভাবে প্রতিফলিত। নজরুলের মিথ প্রয়োগের এই বিশিষ্টতার দিকে সতর্ক হলেই আমরা ব্যক্তি ও শিল্পী নজরুলের মনোভঙ্গির সাহায্যটুকু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো।

শব্দ

নজরুলের কাব্যভাষা তথা শব্দ প্রয়োগের মধ্যেও এই সমন্বয়ী কর্মীরই সতর্ক ও পরিশ্রমী রূপ। তথ্য হিসেবে একথা স্বীকার্য যে নজরুলের পূর্বে মধ্যযুগ থেকেই যথেষ্ট মাত্রায় আরবী-ফার্সি শব্দ বাংলায় জায়গা জুড়ে আছে। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম কিংবা ভরত চন্দ্রের রচনাতেই আরবী-ফার্সি শব্দ সুযোগ মতন জায়গা জুড়ে নিয়েছে। রবীন্দ্র-উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালেও আরবী-ফার্সির অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল।'[৭] তবু নজরুলেই যেন তার সম্পূর্ণতা ও শিল্প স্বার্থকতা দেখলাম আমরা।

ইসলামী শব্দ প্রয়োগের প্রাচুর্য নজরুলের বিদ্রোহাত্মক, স্বদেশ প্রেম-মূলক কবিতায় যেমন, তেমনি প্রেম বিষয়ক কবিতাকেও দিয়েছে আশ্চর্য-দ্যোতনা। ইসলামিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতা রচনায় তো এই জাতীয় শব্দও বাক্যাংশের প্রয়োগ নজরুলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল রাতারাতি। নজরুলের লেখা 'দাড়িমুখে শারিগান লা শারীক আল্লা, পড়ে[৮] তো না দেখা নজরুল ইসলামের দীর্ঘ প্রশংসা করে ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। লিখেছিলেন: " ...... ঐ শেষ ছত্রের শেষবাক্য লা শরাক আল্লাহ'—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"[৯] কেবল এইখানে, আরবী বাকবন্ধকে বাংলা ভাষার সঙ্গে অবলীলায় মিশিয়ে দিতে পেরেছেন নজরুল অনেক কবিতাতেই। একাজটি তিনি মূলত ইসলামিক ঐতিহ্যানুসারী কবিতাতেই করেছেন অধিক মাত্রায়।[১০] এই সব প্রয়োগ দেখে মনে হয় না যে মক্তবের ঐ সীমিত আরবী জ্ঞানই তাঁকে এত বড় শিল্প কর্মের প্রণোদনা দিয়েছে। আরবী-ফার্সী এবং বাংলা

ভাষার শব্দ ও ছন্দের ওপর রীতিমত আধিপত্য না থাকলে এমন সৃষ্টি অসম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ফাতেহা দোয়াজ দহম' 'উমর ফারুক, 'খালেদ' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়।

আজ বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুঁড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায় হি সাল্লাম।১১

ওই দিক হারা দিক পার হতে জোর শোর আসে, ভাসে 'কালাম'
ত্রয় শামসোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কমরোজ্জ আঁ আস সালাম।১২

খালেদ! খালেদ! ফজর হল যে! আজান দিতেছে কৌম্
ঐ শোন শোন—। আস্ সালাতু খায়্‌র্ মিনা ন্নৌম্।১৩

আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলি'
কহিল ফাতেমা—"এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি'
নেমেছে ভুবনে মোহাম্মাদের অমর কণ্ঠে, ভাই!১৪

এইরকম বাক্যাংশের ব্যবহার বাদ দিলেও নজরুলের সমগ্র কাব্য সৃষ্টিতে অজস্র আরবী-ফার্সী শব্দ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত। "নজরুল রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন স্বভাবের তাই রবীন্দ্র-সাম্রাজ্যে থেকেও তুখোড় শব্দ চিত্রে সংস্কৃত লৌকিকের বিচিত্র সমন্বয়ে এবং অশিথিল বন্ধ বাচন ভঙ্গিতে আধুনিক জীবন বোধের পরিচয় আনতে পেরেছেন তার কবিতায়। রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে নজরুল ভাষা গঠনে যেমন স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, তেমনি নিয়ে এসেছেন রক্ত চাঞ্চল্য।১৫ এ ব্যাপারে তাঁর সচেতন শব্দ-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা একটি নিবন্ধে। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'। [প্রবন্ধটি 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় ১৩৩৪, পৌষ ১৪ সংখ্যায় বেরিয়েছিল] নজরুল লিখছেন: আমি শুধু "খুন" নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্য লক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ওই ঢঙের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো 'ইরানী' জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।১৬ নজরুল রবীন্দ্রের এই মতান্তর মনান্তর-এর

জন্ত শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীকে মধ্যস্থতা করে লিখতে হয়েছিল 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা।' "আত্মশক্তি' ফেব্রুয়ারী ৩ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ লিখলেন—'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা।' সে প্রবন্ধ আমাদের একদিকে যেমন জানিয়ে দিল যে, রবীন্দ্রনাথ খুন শব্দের ব্যবহার নিয়ে যে কটাক্ষ হেনেছেন তা উদিত কোনো কবি অর্থাৎ নজরুলকে উদ্দেশ্য করে নয়, উদীয়মান কোনো কবিকেই, অন্যদিকে তেমনি জেনে গেলাম আমরা যে নিজের বাল্মীকি প্রতিভায় খুন শব্দটা ব্যবহার করেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ৬ [পূর্ণেন্দু পত্রী/লেখালেখি ১. এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং ১৩৩৯, পৃঃ ২৬৫]। যাই হোক, নজরুলের ঐ উক্তি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নজরুল শব্দ প্রয়োগে—মূলত আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগে যথেষ্ট সচেতন শিল্প বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই সচেতনা তাঁর সার্বিক কাব্যকৃতিতে সঞ্চারিত হলে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য কবি-প্রতিভা বলে চিহ্নিত হতে পারতেন।

দেহ সজ্জায় কাব্য অমনযোগ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ছাপা হবার পর নজরুল সম্পাদককে যে চিঠি লেখেন তার একটি অংশ :

"আমাদের এখানে সময়ের Money Value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না।[১৭] এই চিঠি লিখেছিলেন তিনি ১৯, আগাষ্ট, ১৯১৯, আর তাঁর অসুস্থতার সূত্রপাত ১৯৪২ এর জুলাইতে। এই দীর্ঘ ২৩ বছরে নজরুল লিখেছেন অজস্র। কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক। আর লিখেছেন তাঁর ভাষায় 'Undisturbed' না থেকে। বরং বলা যায় রীতিমত দিনে দিনে এই Disturbance বেড়ে ছিল। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত—সব দিক থেকেই আহত ছিলেন কবি। বেদনার উৎস থেকে যে অলৌকিক আনন্দ-উৎসার ঘটে, তাকে রূপায়িত করার মত নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ নজরুল পান নি। একথা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করেও আমাদের নজরুল ইসলামের কাব্য দেহ সজ্জায় অমনোযোগের কথা ভাবতে হয়।

অনেক সমালোচকই নিরপেক্ষ ভাবে একথা বলতে চেয়েছেন যে, নজরুল শিল্পকলা সম্বন্ধে বড় একটা সচেতন ছিলেন না। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত বলেছেন, "আর্টের বিষয়ে নজরুলের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রধানত নিজের প্রতিভা সম্পর্কে অচেতন (unconscious) শিল্পী। নিজের

সৃষ্টির ভালোমন্দ ও উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তাই তাঁর সাহিত্যে স্বর্ণরেণু ও বালুকণার সহাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। একটি অত্যুৎকৃষ্ট পংক্তির পাশে একটি স্থূল পংক্তির আবির্ভাব তাঁর রচনায় হামেশাই ঘটেছে।১৮

নজরুলের এই অনর্গল অচেতন বাক্য বিন্যাসের' সূত্র অনুসন্ধানে বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ—এবং দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুত বেগে, ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেন নি। কোথায় থামতে হবে দিশে পান নি।...এদিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে—সেই কাঁচা কড়া উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা কাব্যের কল কব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য শৈথিল্য, সেইরসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। বায়রন সম্বন্ধে গ্যেটে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে কথা সত্য :

'The moment he thinks, he is a child.';১৯

বস্তুত, নজরুল ইসলামের কবিতা এবং গানে মাঝে মাঝে এমন অনেক শব্দ আসে—চলে আসে যা অবাঞ্ছিত। শুধু বাক্যটির নয়, সমগ্র রচনাটির মান নামিয়ে দেবার পক্ষে ঐ বিশেষ শব্দটিই যথেষ্ট।

এ সবই সত্য কিন্তু এই বেপরোয়া, অযত্ন শিথিল শব্দাবলীকে কবিতায় ব্যবহারে নজরুলের কবিতার যতই ক্ষতি হোক পরবর্তী কালের কাব্য সাধনায় নজরুলের এই 'আত্মহত্যা' অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল এ ব্যাপারটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনি। 'ঠ্যাং'...'জেনে,' 'বেল্লিকপনা,' 'বাজখাই,' 'মুখ গুঁজে পড়ে থাকে,' প্রভৃতি শব্দও বাক বন্ধ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কবিদের শব্দ ব্যবহারের জড়তা ও সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিয়েছিল। সমবয়সী জীবনানন্দে তো রীতিমত এই শব্দ প্রয়োগের দুঃসাহস দেখা যাবে। দেখা যাবে বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, সুকান্তের কাব্য কায়া গঠনে কার্যকরী হয়েছে নজরুলের এই আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার সাবধানী ঘণ্টাধ্বনি।

নজরুল কাব্যের রূপশৈলী

তথ্যপঞ্জী

১। কাজী আব্দুল মান্নান / আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা /

২। চিঠিপত্র / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / হরফ ১৩৩৯ / পৃঃ ৪৩৯-৪০
৩। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / নজরুল চরিত মানস / ভারতী লাইব্রেরী ১৩৩৯ / পৃঃ ৩০৮
৪। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্য সমীক্ষা, মুক্তধারা ভারতীয় সংস্করণ

৫। বেগম আক্তার কামাল / বিষ্ণুদের কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ / মুক্তধারা

৬। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫
৭। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩১৫
৮। খেয়াপারের তরণী / অগ্নিবীণা
৯। 'মোসলেম ভারত' এর সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের চিঠি। আজীজ আল আমান সাহেবের নজরুল পরিক্রমা ২য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত / ১৩৩৯ নং / পৃঃ ২৯ (২য় খণ্ড)
১০। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৯৫
১১। ফাতেহা দোয়াজ রহম / নজরুল রচনাসম্ভার ৩য় খণ্ড / হরফ ১৯৮১ / পৃঃ ৩
১২। ফাতেহা দোয়াজ দহম / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪
১৩। খালেদ / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৫
১৪। ওমর ফারুক / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৪
১৫। সত্যাগ্রহ / একালের গন্তপন্থ আন্দোলনের দলিল

১৬। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৪২—৩৪৩
১৭। চিঠিপত্র / বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / পূর্বোক্ত পৃঃ ৪০৪
১৮। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৯৭
১৯। বুদ্ধদেব বসু / কালের পুতুল / নিউ এজ ১৯৫৯ / পৃঃ ১৩০
